বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

ভূপাল বর্ষপঞ্জী

"করকে দেখা— সমঝ গয়া"

বিজ্ঞানচর্চার এদেশ ওদেশ

শতবর্ষে নীল্‌স বোর

কার স্বার্থে বেবীফুড

ক্যানসার প্রতিকারে বিজ্ঞান

নিউক্লিয়ার আবর্জনা ডাম্‌পিং

নবম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা জানুয়ারী–ফেব্রুয়ারী 1986

দাম দু' টাকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

নবম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী 1986

চিঠিপত্র ঃ শব্দের সীমা □ ভূপাল যেদিন হ'ল এবং তারপর—শিবপ্রসাদ নিয়োগী □ ভূপালের বন্ধু রবার্ট হেগার □ করকে দেখা সমঝ গয়া ঃ একটি বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ শিবিরের কথা—সুভাষ গাঙ্গুলী □ বিজ্ঞানচর্চার এদেশ ওদেশ—স্বরূপ গুপ্ত □ জন্মশতবর্ষে, নীলস্ বোর স্মরণে—সুব্রত ভট্টাচার্য □ ক্যানসারের প্রতিকার – ভাস্কর মৈত্র ও সুকুমার সাহা □ ভূপাল ঃ রাষ্ট্রীয় অভিযান সমিতি - রিপোর্ট □ কার স্বার্থে বেবীফুড—স্মরজিৎ জানা □ নাট্য সমালোচনা—পার্থ সেন □ ভূপালে দশজন 'হ্যাম'—রিপোর্ট □ পুস্তক সমালোচনা ঃ মার্কস ও গণিত—সোমনাথ চক্রবর্তী □ পরিবেশের খবর ঃ নিউক্লিয়ার আবর্জনা ডাম্পিং/দূষণের দায়ে বিড়লা গোষ্ঠী □ বিজ্ঞান পুস্তিকা পরিচিতি-2 রবীন মজুমদার □

গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায় □ বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার বারো টাকা □ প্রতিষ্ঠানিক চাঁদা—চল্লিশ টাকা □ বাংলাদেশের জন্য—ভারতীয় টাকায় কুড়ি টাকা (সাধারণ ডাকে পাঠালে বারো টাকা) □ এজেন্ট কমিশন ঃ দশ কপির উপর পঁচিশ শতাংশ এবং একশ কপির উপর তেত্রিশ শতাংশ □ এজেন্সীর জন্য নীচের ঠিকানায় লিখুন।

যোগাযোগের ঠিকানা

প্রতি সোমবার ও বুধবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে ন'টা 2/1A আশুতোষ শীল লেন, কলকাতা-9 (সুকিয়া স্ট্রীটে ঢুকে খোঁজ করুন) □ ডাকে যোগাযোগের ঠিকানা (1) অভিজিৎ লাহিড়ী, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, EC 106 সল্ট লেক, কলকাতা-700064 ; (2) c/o ডি. এস. এণ্টারপ্রাইজ, 52/9C, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-700012 □

বি-ও-বি'র ভাষা নিয়ে পাঠকের প্রতিক্রিয়া

শব্দের সীমা

নভেম্বর-ডিসেম্বর '85 সংখ্যার "বিজ্ঞানের সীমা" লেখাটার মত করে "শব্দের সীমা" কথাটা ব্যবহার করলাম। না, এ শব্দ কিন্তু আওয়াজ নিয়ে নয়। আমরা যে সব শব্দ বিভিন্ন পত্রিকার নানা লেখায় ব্যবহার করে থাকি এ তাই এবং সে সম্বন্ধে আমার দুটো কথা আছে। এক। আমার মনে হয় আমাদের লেখায় সেইসব শব্দ-গুলো এড়ানোর চেষ্টা করা যেতে পারে যেগুলো বিতর্কিত এবং সেইজন্যেই আমাদের বন্ধু সহ-কর্মীদের আহত করে। উদাহরণের জন্যে লিখছি,—"গ্যাস আর ছাইয়ের কবলে খড়দহ-টিটাগড়" লেখাটা এমন একটা সমস্যাকে নিয়ে যাকে ঘিরে বহু ভিন্ন মতামতের লোকজনও এক ছাতার তলায় দাঁড়াতে পারেন। কিন্তু লেখার প্রায় শুরুতেই "ভোট-ভিক্ষুক" কথাটা ব্যবহার করাতে এমন সম্ভাবনা তো থাকতে পারে যাতে লেখাটার আসল উদ্দেশ্যের দিকে তাকানোর আর কোন ইচ্ছেই মন থেকে হবে না আমাদের সেই বন্ধুটির যিনি এই ভোটব্যবস্থার একজন কর্মী। ভোটের দরকার আছে কি নেই —এ নিয়ে যদি "হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান"-এর মত কোন আলোচনা শুরু হয় তখন পক্ষে ও বিপক্ষে নানারকম মন্তব্য রাখা যেতে পারে। কিন্তু একটা মানবদরদী লেখায় "...রাজ-নৈতিক দাদাদের মোটা বক্তৃতা ও স্বজনপোষণের হাত ধরে অর্থ-পিপাসু সরকারী, আধা সরকারী,

(শেষ অংশ বাইশ পৃষ্ঠায়)

'ভূপাল' যেদিন হ'ল এবং তারপর

এক বছরেরও কিছু বেশী আগে ঘটেছে সেই নারকীয় 'গ্যাসকাণ্ড'। আর তারপর থেকে বারবারই একটা শব্দ জনসাধারণের কাছে ফিরে ফিরে এসেছে—"ভূপাল"। না, তথ্য গোপন করে উল্টোপাল্টা প্রচার চালিয়েও এই ঘটনাকে আর দশটা দৈনন্দিন ঘটনার মতো 'স্মৃতির অ্যালবামে' তোলা যায়নি। চোখ কান খোলা রাখা মানুষ জানেন ভূপাল কোন অতীতের হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা নয়, বরং ভবিষৎ বিপদের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। সুস্থ ও সজীব পরিবেশে বাঁচার প্রশ্নটি মানুষকে নাড়া দিয়েছে। এর পেছনে রয়েছে সারা ভারতে ছড়িয়ে থাকা পরিবেশ ও জনবিজ্ঞান আন্দোলনে যুক্ত ছোটছোট সংগঠনের নিরবিচ্ছিন্ন ও দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টা।

ভূপালে অগণিত গ্যাস আক্রান্ত মানুষকে নির্বিষকরণের জন্য কাজ করছে "জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র"—আর্থিক অভাব, পুলিশী হাঙ্গামা, সুপরিকল্পিত অপপ্রচার সত্ত্বেও তা আজ ভূপালবাসীদের "হামারা অস্পাতাল"—এ পরিণত হতে পেরেছে।

এই গোটা বছরটাই পরিবেশ ও জনবিজ্ঞান কর্মীদের কাছে "ভূপাল বছর"। আর "ভূপাল" আমাদের পরিবেশ ভাবনা ও ভবিষৎ ঐক্যবদ্ধ পরিবেশ আন্দোলনের সম্ভাবনার প্রতীক।

এখানে গত একবছরে ভূপাল দুর্ঘটনার পর যে সব উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রাখা হলো।

3রা ডিসেম্বর '84—ডঃ হীরেশ চন্দ্র মৃতদেহগুলো ব্যবচ্ছেদ করে দেখেন যে শিরার রক্ত চেরীর মতো লাল। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে মৃত্যুর কারণ "সায়ানাইড" বিষক্রিয়া। এর প্রতিষেধক হিসেবে তিনিই প্রথম সোডিয়াম থায়োসালফেট ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

4ঠা ডিসেম্বর '84—জার্মান বিষক্রিয়া বিশেষজ্ঞ ডাঃ ম্যাক্স ডানডরর সায়ানাইড বিষক্রিয়ার প্রমাণ পান। চক্রান্তকরে তাকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। চলে যাবার আগে তিনি ভূপালের গ্যাস আক্রান্ত মানুষের জন্য 10,000 অ্যাম্পুল সোডিয়াম থায়োসালফেট রেখে যান।

7ই ডিসেম্বর '84—ভূপাল বিমান বন্দরে গ্রেপ্তার করা হলো ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানীর চেয়ারম্যান অ্যান্ডারসন এবং ইউনিয়ন কার্বাইড ইণ্ডিয়া লিঃ এর চেয়ারম্যান কেশব মাহিন্দ্রকে। এ খবরে ভূপালের গ্যাস আক্রান্ত অগণিত রুগ্ন মানুষের সঙ্গে আমরা খুশী হলাম। কিন্তু না, ভারতীয় আইনের 'বজ্র আঁটুনী' অ্যান্ডারসনের বেলায় "ফস্‌কা গেরো" হয়ে যেতে দেরী হলোনা। কার্বাইডের সুরম্য অতিথিশালায় বিশ্রাম নেবার পর তিনি উড়ে গেলেন নিজ দেশে।

12ই ডিসেম্বর '84—সরকার ঘোষনা করলেন যে মিকপ্লান্টে জমে থাকা অবশিষ্ট মিক নিস্ক্রিয় করার জন্য অপারেশান ফেথ' চালানো হবে। এ সময়ে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে সরকার দায়িত্ব নিতে পারবেন না, অধিবাসীরা ইচ্ছে করলে ভূপাল ত্যাগ করতে পারেন।

ভূপাল ছেড়ে পালাবার হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো। ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ গরু ভেড়ার মতো বাসে ট্রেনে পালাতে লাগলেন।

13ই ডিসেম্বর '84—ডাঃ এস. এস. নাণ্ড সরকারী ডাক্তারদের লিখছেন—"যতক্ষণ রাসায়নিক বিশ্লেষণে রক্তে সায়ানাইডের উপস্থিতি প্রমাণিত না হচ্ছে ততক্ষণ সোডিয়াম থায়ো-সালফেট এর ব্যবহার করবেন না"।

16ই ডিসেম্বর '84—শুরু হলো 'অপারেশন ফেথ'। সঞ্চিত মিকের অপচয়ে যাতে কোম্পানীর ক্ষতি না হয় সেদিকে সরকারের কড়া নজর। মিককে নিস্ক্রিয় করার অন্যান্য পদ্ধতি অনুসরণ না করে, 'সেভিন' বানানো হলো।

4ঠা জানুয়ারী '85—জাহ্‌রেলী গ্যাস কাণ্ড সংঘর্ষ মোর্চার পক্ষ থেকে মধ্যপ্রদেশ সরকারকে 30 দফা দাবী সম্বলিত একটি দাবীপত্র দেওয়া হলো।

17-18ই ফেব্রুয়ারী '85—ভূপালের গান্ধীভবনে এক জাতীয় অধিবেশনে 65টি সংগঠনের 150 জন প্রতিনিধি কতগুলো প্রস্তাব গ্রহণ করেন। গঠিত হয় 'জাতীয় প্রচার সমিতি'। ঠিক হলো সারা ভারত থেকে সংগৃহীত স্বাক্ষর সম্বলিত একটি দাবীপত্র প্রাধনমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হবে।

23 শে মার্চ '85—জাহ্‌রেলী গ্যাস কাণ্ড সংঘর্ষ মোর্চা ও দিল্লী থেকে আসা মহিলা সংগঠনের সদস্যরা ডি. আই. জি. বাংলোতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং ডাঃ এস. এন. নাগুকে ঘেরাও করা হয়।

4ঠা এপ্রিল '85—ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব্‌ মেডিকেল রিসার্চ তাদের সোডিয়াম থায়োসালফেট প্রয়োগের সফল পরীক্ষার খবর সংবাদ পত্রকে দিলেন। সংস্থার তরফ থেকে সোডিয়াম থায়োসালফেট ইন্‌জেকশান ব্যবহারের একটি পদ্ধতি নির্দেশ করা হয়।

3রা জুন '85—ভূপালের জনতা কার্বাইডের গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং একটা অংশ দখল করে নেয়। সেই মুক্ত অঞ্চলে গড়ে ওঠে জনগণের হাসপাতাল—'জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র'। এই কেন্দ্রকে সহায়তা করে, নাগরিক রাহত্‌ আউর পুনর্বাসন কমিটি, ট্রেড ইউনিয়ন রিলিফ ফাণ্ড, ইউনিয়ন কার্বাইড কর্মচারী সমিতি এবং জাহ্‌রেলী গ্যাস কাণ্ড সংঘর্ষ মোর্চা।

24 শে জুন '85—ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবীতে ভূপালের মানুষ বিশাল মিছিল বের করেন। সেই রুগ্ন, দুর্বল গ্যাস আক্রান্ত মানুষের ওপর নির্মম লাঠি চালিয়ে ভূপালের পুলিশ বর্বরতার আর এক নতুন নজির সৃষ্টি করে। জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র তছনছ করে দেওয়া হলো ; গ্রেপ্তার হলেন সব স্বাস্থ্যকর্মী ও জনবিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীরা।

28 শে আগষ্ট '85—সুপ্রিমকোর্টের রায়ে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে প্রয়োজনীয় সোডিয়াম থায়োসালফেট দেবার আদেশ সরকারকে দেওয়া হলো।

9ই সেপ্টেম্বর '85—কেঁইচি ছোলাতে গড়ে উঠলো নতুন জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র। আবার শুরু হলো ইন্‌জেকশন দেবার কাজ।

2-4 ডিসেম্বর '85—ভূপাল ঘটনার বর্ষপূর্তি। দেশ বিদেশ থেকে সাংবাদিক, ফোটোগ্রাফাররা এসে ভূপাল ছেয়ে ফেললেন। 'ভূপাল' আবার খবর হল।

16ই ডিসেম্বর '85—ভূপালের মর্মান্তিক ঘটনাকে স্মরণ করে দুই মরমী শিল্পী সৃষ্টি করেছেন এক ভাস্কর্য। সদ্যজাত সন্তান কোলে দাঁড়িয়ে আছেন এক মা। যন্ত্রনা ও বেদনাদীর্ণ তার মুখ। পেছনে মৃতপ্রায় অপর সন্তান। এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে সেই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন বস্তির মায়েরা। শিল্পী—রুথ ওয়াটারম্যান ও সঞ্জয় মিত্র।

20শে জানুয়ারী '86—জাতীয় প্রচার সমিতির অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত 'কার্বাইড বিরোধী সপ্তাহ' পালন করা হবে। ঠিক করা হয় কার্বাইডের সব হোর্ডিং ও পোস্টার কালো রং লেপে দেওয়া হবে। রেডিও-টিভিতে কোম্পানীটির বিজ্ঞাপন প্রচারিত হলে বিক্ষোভ দেখানো হবে, এরং জনগনকে কার্বাইডের উৎপন্ন জিনিষ বয়কট করতে আবেদন করা হবে।

এই হলো ভূপালের ঘটনাবহুল এক বছরের বিবরণ। ভবিষ্যতে আরো অনেক ঘটনা ঘটবে। কারণ ভূপালে কাজ থেমে নেই। ভূপালের মানুষ এখন অনেক সচেতন হয়েছেন। নিজেদের বিষমুক্তির দায়িত্ব তারা নিজেরাই নিয়েছেন। সরকারী বঞ্চনা ও প্রতারণাই ভূপালের শেষ কথা নয়। বরং ভূপালে এবং দেশের অন্যত্র কিছু সজাগ মানুষের প্রয়াস সত্যিই ভূপালকে বিষমুক্তির সম্ভাবনা দেখাতে পেরেছে। □

শিবপ্রসাদ নিয়োগী

'ভূপাল'-এর বন্ধু রবার্ট হেগার

"If Justice is done in this case it will amount to the demise of Union Carbide—the transfer of ownership to the Victims."

উপরের উক্তিটি যাঁর, সেই স্বনামধন্য আইনজীবী রবার্ট হেগার কলকাতা ঘুরে গেলেন সম্প্রতি, সঙ্গে ছিলেন লিনডা টামাল্টি। এঁরা আমেরিকার মহামান্য জজ কেনানের কোর্টে ভূপালের হাজার হাজার গ্যাস পীড়িত মানুষদের জন্য লড়ছেন নেহাতই মানবিকতার তাগিদে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—রবার্ট হেগার সেই বিখ্যাত কারন সিলকউড কেসে লড়াই করে জিতেছিলেন। কয়েকটি বিজ্ঞান সংস্থা ও দূষণবিরোধী সংগঠনগুলির আমন্ত্রণে রবার্ট দ্বারভাঙ্গা হলে এক অন্তরঙ্গ, খোলাখুলি আলোচনায় মিলিত হন সাধারণ মানুষ আর সাংবাদিকের সঙ্গে, হেগারের আশঙ্কা ভারত সরকার, ইউনিয়ন কার্বাইড আর আমেরিকার কিছু পেশাদার আইনজীবী (কাগজের ভাষায় 'Ambulance Chasing Lawyears') কোর্টের বাইরে মিটমাটের চেষ্টা করছে। কার্বাইড-ও চাইছে মোটামুটি 60 কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দিয়ে ব্যাপারটার নিস্পত্তি করতে। অথচ রবার্ট মনে করেন প্রকৃত ব্যাপারে, এই ক্ষতিপূরণ হওয়া উচিত অন্ততঃ 500 কোটি ডলার (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য কার্বাইডের মোট সম্পত্তির মূল্য 500 কোটি ডলার)। সেই সঙ্গে রবার্ট হেগার একটি ভয়াবহ তথ্য জানালেন। কার্বাইড কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই, তাদের সম্পত্তি বিক্রি করতে শুরু করেছে। উদ্দেশ্য—তারা দেখাবে তাদের সম্পত্তির পরিমাণ রায়ে দেয় অর্থের থেকে অনেক কম। হেগাররা এ ব্যাপারটি জানলেও আইনানুযায়ী কিছু করতে পারবেন না। একমাত্র ভারত সরকার এ ব্যাপারে ইঞ্জাংশন আনতে পারেন। হেগার আবেদন জানান ভারতে এ ব্যাপারে অতি শীঘ্র জনমত ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে।

শুধুই মানবিক আর গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য লড়াই করেন—পৃথিবীর বিরল এইসব আইনজীবিদের অন্যতম রবার্ট হেগারের ভূপাল সম্পর্কে অনুভবের আরো বিশদ বিবরণ পরবর্তী সংখ্যা বি-ও-বি-তে দেবার ইচ্ছে রইল —সঃ মঃ

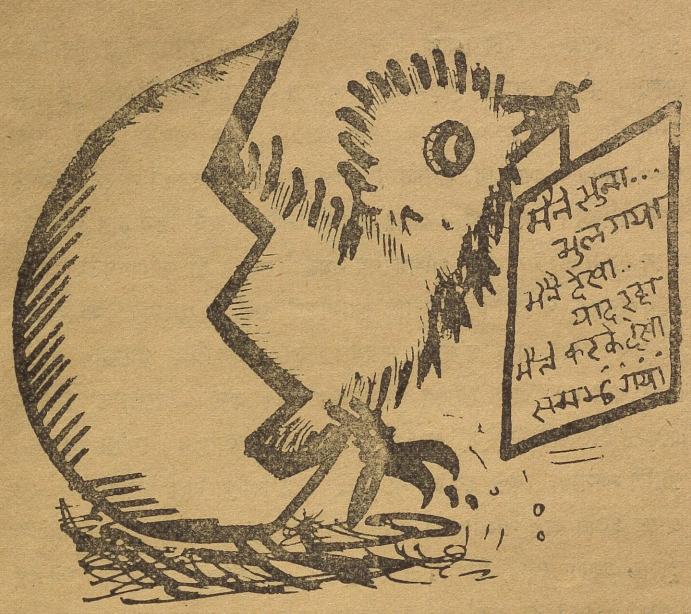

করকে দেখা সমঝ গয়া

একটি বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ শিবিরের কথা

সুভাষ গাঙ্গুলী

"হমনে শুনা ...ভুল গয়া
হমনে দেখা ...য়াদ রহা
হমনে করকে দেখা ....সমঝ গয়া"

উজ্জয়িনীতে আয়োজিত 'একলব্য' সংস্থার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ শিবির—'উচ্চশিক্ষিত' পর্যবেক্ষকের কাছে এক অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা। প্রাথমিক বিজ্ঞান শেখা আর শেখানোয় নতুন করে হাতে-খড়ি।

শিশুর হাতের আঁকাবাকা কাঁচা অক্ষরে ওপরের ওই তিনটি লাইন ষষ্ঠ মানের বিজ্ঞানের একটি পাঠ্য বইয়ের শেষ প্রচ্ছদে বিজ্ঞাপনের মত সোচ্চার মোটা হরফে ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বইয়ের নামপত্রে রচয়িতাদের তালিকার নীচেই লেখা রয়েছে—

সমর্পণ

ক্ষেতমজুর ছোট কিষাণ ও গাঁয়ের সেইসব অধিকাংশ শিশুদের যারা স্কুলে যেতে পারছে না, গত ছ' বছর ধরে যাদের কাছ থেকে বিজ্ঞান-শিক্ষণকে গাঁয়ের জীবন ও পরিবেশের সাথে জুড়বার প্রেরণা পাওয়া গিয়েছে।

"প্রেরণা"-গ্রহীতাদের অর্থাৎ রচয়িতাদের মধ্যে রয়েছেন নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান সমহের কিছু লোকজন ঃ

- ☐ টাটা ইন্‌স্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, বোম্বাই
- ☐ বিজ্ঞান শিক্ষণ গ্রুপ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়
- ☐ মধ্যপ্রদেশ মহাবিদ্যালয় বিজ্ঞান শিক্ষণ দল
- ☐ ফ্রেন্ডস্ রুরাল সেন্টার, রসুলিয়া, হোসাঙ্গাবাদ
- ☐ কিশোর ভারতী, বনখেরী প্রখন্ড, হোসাঙ্গাবাদ

এবং

- ☐ 1972 সাল থেকে 'করা আর শেখা' এই নীতিতে যাঁরা বিজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন, হোসাঙ্গাবাদ জেলার 16টি গ্রামীণ মাধ্যমিক শিক্ষায়তনের বিদ্যার্থী ও শিক্ষকরা।

উল্লেখ্য এঁদেরই দ্বারা রচিত হয়েছে সপ্তম ও অষ্টম মানের আরও তিনটি পাঠ্য বই। এইগুলি হোসাঙ্গাবাদ জেলার (মধ্যপ্রদেশ) সমস্ত মাধ্যমিক স্কুলে (সংখ্যায় আড়াইশ'র মত) এবং উজ্জয়িনী, ধর, মনসুর ইত্যাদি কয়েকটি জেলার বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ান কিছু কিছু স্কুলে অবশ্য-পাঠ্য বিজ্ঞান পুস্তক হিসেবে সরকারী স্বীকৃতি আদায় করেছে। রচয়িতাদের অন্যতম কিশোরভারতী সংস্থা ও ফ্রেন্ডস্ রুরাল সেন্টার (যাদের গ্রামীণ উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতামুখী নানা প্রকল্প ছিল) আঞ্চলিক ভাবে (অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশে) এই প্রকল্পকে রূপায়িত করার সাংগঠনিক উদ্যোগে ছিলেন। পরে এই কার্যক্রমের পরিধি এঁদের অন্য সব প্রকল্পের তুলনায় অনেক বেশী বেড়ে ওঠে। কাজের সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে 1982 সালে 'একলব্য' নামে আর একটি স্বতন্ত্র সংস্থার জন্ম হয়। বিজ্ঞান শিক্ষার কার্যক্রম চালনার দায়িত্ব তখন থেকে পুরোপুরি এঁদের উপর পড়ে। নতুন এই সংস্থাতে প্রকল্পের ভ্রূণাবস্থা থেকে কিশোর ভারতী ও রুরাল সেন্টারের সাথে জড়িত কর্মীরা তো আছেনই সাথে সাথে আরও নতুন নতুন কর্মীরাও (অধিকাংশই স্কুল বা কলেজের শিক্ষক) যোগ দিচ্ছেন।

প্রতি বছরই গরমের ছুটির সময় অর্থাৎ মে-জুন মাসে 'একলব্য' মধ্যপ্রদেশের দু'জায়গায় (হোসাঙ্গাবাদ ও উজ্জয়িনী) তাদের বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক-কেন্দ্রীক এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে। 1985-তে উজ্জয়িনীর (হ্যাঁ, শিপ্রা নদীর তীরবর্তী কালিদাসের কালের সেই উজ্জয়িনী) প্রশিক্ষণ শিবিরে পশ্চিমবাংলা থেকে আমরা দুজন (আমি ও দীপক—দীপক পাল) একরকম রবাহূত হয়েই হাজির হয়েছিলাম।

হাজির হয়েছিলাম প্রধানত এঁদের অভিনব (অর্থাৎ শুনে সেই রকমই মনে হয়েছিল, দেখে সেই ধারণা আরও জোরদার হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই) পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু বিক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিচিত কয়েকজন বন্ধুর দেওয়া টুকরো টুকরো খবর থেকেই এই প্রকল্পের কথা গত দু তিন বছর ধরে আমরা মাঝে মাঝে জেনেছিলাম। প্রথমে এক সপ্তাহের জন্যই গিয়েছিলাম। কিন্তু রয়ে গেলাম কার্যক্রমের গোটা সময়টাই—অর্থাৎ তিন সপ্তাহ। সেটা কতটা কার্যক্রমের সত্যিকারের আকর্ষণী শক্তি আর কতটা আমাদের দ্রুত সম্মোহিত হবার প্রবণতা (অর্থাৎ যথেষ্ট পরিণত মনের সম্ভাব্য অনুপস্থিতিতে যে বিপদ সব সময়েই থাকে) তা'র নিরপেক্ষ বিচারক যে আমরা নিজেরা হতে পারি না সেকথা বলাই বাহুল্য। তবে ভাল যে লেগেছিল সেকথা অকপটে স্বীকার করতেই হবে। আর বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থা থেকে সময়ের হিসেবে এত দূরে আসার পরও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষাক্রম যে আমাদের পক্ষে শিক্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে সেটা আবিষ্কারের অনুভূতিটাও মন্দ লাগে নি—মাঝে মাঝে এমনকি উল্লসিতও বোধ করে ফেলেছি। অবশ্য এ সত্ত্বেও কার্যক্রমের খুঁত যে বের করতে পারিনি বা মাথার মধ্যে কোন ব্যাপারে কোন জিজ্ঞাসা চিহ্নের জন্ম হয়নি এরকম অপবাদ আমাদের কেউ দিতে পারবে না। তবে নীচের কয়েকপাতা জোড়া বাচালতায় খুঁতের বিবরণ উল্লেখ তেমন নেই। মূলত দেখে যা ভাল লেগেছে ও মনে হয়েছে তাকেই সবার সাথে ভাগ করে নেবার একটা চেষ্টা আছে। যদি বন্ধু সম্পাদক-মণ্ডলী এবং পাঠকরা সেটা সহ্য করে নিয়ে আমাদের বাচালতার সীমা পরীক্ষায় আগ্রহ দেখান তো খুঁত বা সংশয়ের খবর বারান্তরে দেওয়া যেতে পারে। সাবধান করে দেওয়া দরকার যে খন্ড খন্ড চিত্রে বিবৃত এই আলেখ্যর কোনরকম সম্পূর্ণতার দাবী নেই। বিবরণ থেকে আলোচ্য কার্যক্রমের (অর্থাৎ তার বৈশিষ্ট্য, সবলতা, দুর্বলতা, সমস্যা ইত্যাদি) কিছু আভাসমাত্র পাওয়া যেতে পারে। তার থেকে বেশী কিছু নয়। তথ্য বা তত্ত্বগত কিছু ভুলভ্রান্তি থেকে যাওয়াও বিচিত্র নয়। সেসব যাঁরা দেখিয়ে দিতে রাজী হবেন তাঁদের অগ্রিম কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখি।

গল্প শুরু করার আগে খেয়াল করিয়ে দেওয়া যেতে পারে এখানে "শিক্ষার্থীরা" মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক। প্রশিক্ষকদেরও অনেকেই তাই। তবে শেষোক্তদের মধ্যে কিছু সংখ্যায় কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বা ভূতপূর্ব (বয়েসের কারণে নয়, স্বেচ্ছায়) শিক্ষক ও গবেষক আছেন। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকরা (মধ্যপ্রদেশে যার অর্থ ষষ্ঠ মান থেকে অষ্টম মান এই তিন শ্রেণী) কি পড়াবেন ও কেমন করে পড়াবেন তাই নিয়েই এই প্রশিক্ষণ।

ডিম শাবক আর মুরগীর ঠ্যাং

শুরু থেকে প্রশিক্ষণ শিবিরের একটা ছবি দিই।—পুরুষ ও মহিলা মিলে নরম রোদ্দুরে ছাওয়া স্নিগ্ধ একটি সকাল। বিভিন্ন ঘরে ছ'টা ক্লাস চলছে (7টা থেকে 12টা)। মাঝখানে আধ ঘণ্টার বিরতি। একটা ক্লাসে ঢুকে পড়লাম। পুরুষ ও মহিলা মিলে ক্লাসের জনা ত্রিশেক শিক্ষার্থী চার চার জনের এক একটি ছোট দলে (ওখানকার পরিভাষায় 'টোলি') ভাগ হয়ে হয়ে শতরঞ্চী পাতা মেঝেতে বসে আছেন। ঘরে কোন বসার চেয়ার নেই। জনা তিন চার প্রশিক্ষক (যে কোন একটা বিষয় প্রশিক্ষণের সময় এঁদের মধ্যে সাধারণতঃ একজন মূল গায়েন থাকেন। অন্যেরা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, সংশোধন, সংযোজন, টিকা ইত্যাদির মাধ্যমে ধুয়া ধরেন। তবে একাধিক গায়েনও প্রায়ই দেখা যায়।) এসে 'টোলি' পিছু এক প্রস্থ করে 'যন্ত্রপাতি' (এঁরা এক্ষেত্রে ইংরেজী 'কিট্‌স্' শব্দটিই ব্যবহার করে থাকেন) বেঁটে দিলেন। টোলি সদস্যরা কেউ কেউ নিজেরাই উঠে কিট্‌স নিয়ে নিলেন। এতে আছে একটা করে পলিথিনের কানা উঁচু প্লেট ও ছোট বাটি। খানিকটা তুলো, একটা ছোট চিমটে, একটা ড্রপার, একটা ছুরি, একটা পরখ-নল (টেস্ট টিউব), ও একটা ছোট আতস কাঁচ (ওখানকার ব্যবহৃত পরিভাষায় 'হ্যান্ডলেন্স')। এরপর প্রতি টোলিই পরীক্ষার উপকরণ হিসেবে তা' দেওয়া নয়, এমন এক জোড়া করে মুরগীর ডিম পেলেন—যার একটি কাঁচা ও অন্যটি সেদ্ধ।

> "বেশ একটা উপভোগ্য আলোচনা'র সূত্রপাত হ'ল। ঘরময় গুঞ্জন—মানে ছোটেবেলায় আমরা যাকে 'পিনড্রপ সাইলেন্স' বলতাম তার একেবারে উল্টো, এবং প্রশিক্ষকরা দুই ঠোঁটের সামনে আঙুল ধরে কথা থামান'র বদলে নিজেরাই সেই 'গোলমালে' যোগ দিলেন।"

প্রশিক্ষকরা নিজেরা এবং তাদের দেখাদেখি ও পরামর্শ অনুযায়ী অন্যেরা **পরীক্ষা শুরু** করলেন। পলিথিনের ছোট বাটির ভেতরে তুলোর গদি তৈরী করে তার উপর কাঁচা ডিমটা রাখা হ'ল। চিমটের সাহায্যে কাঁচা ডিমের শক্ত খোলাটা অল্প একটু খুলে নিয়ে (ডিমের ভেতরটা যাতে পুরো বেরিয়ে না আসে সে ব্যাপারে পরীক্ষকরা বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের কথা খেয়াল করিয়ে দিলেন) খালি চোখে যা দেখতে পাওয়া গেল তার একটা বিবরণমূলক তালিকা সবাই বানালেন (যেমন, সবার সাথে আমরাও দেখলাম স্বচ্ছ তরল পদার্থের মধ্যে ভাসমান পীত বা কমলা রঙের গোল অস্বচ্ছ নরম একটা অর্ধ কঠিন জিনিষ, খোলার ঠিক নীচেই অর্ধ স্বচ্ছ একটা পর্দা যা স্পষ্টতই ভেতরের জিনিষটাকে ঘিরে আছে ইত্যাদি)। তালিকা শেষে দেখা জিনিষগুলির নাম (যেমন স্বচ্ছ তরল বস্তুটা—অ্যালবুমেন, পীত বা কমলা রঙের জিনিষটা—ইয়োক্, অর্ধ স্বচ্ছ বস্তু—ঝিল্লী ইত্যাদি) তাদের জৈবিক উপাদান (যেমন প্রোটিন, চর্বি, ভিটামিন

ইত্যাদি) ও সেই প্রসঙ্গেই **এই পরীক্ষা থেকে** জীব কোষের কাঠামো যা চোখে দেখা যাচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর চলল। নির্দিষ্ট উত্তরে পৌঁছানর সাথে সাথে সবাই (প্রশিক্ষক সহ) তা খাতায় লিখে ফেলছেন।

আবার পরীক্ষা। এবার আতস কাচ বা 'হ্যান্ড লেন্স' দিয়ে সবাই দেখলেন আর কিছু দেখা যাচ্ছে কি'না। কোন কোন ডিমে দেখা গেল পীত রঙের কুসুম বা ইয়োক এ অতি ছোট একটা সাদা রঙের প্রায় ফুটকীর মত কিছু দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সব ডিমে তা পাওয়া গেল না। সবাই তাঁদের নিরীক্ষণ নথিবদ্ধ করলেন ও এই দুই পরীক্ষা মিলিয়ে কাঁচা ডিমের ভেতরের একটা মোটামুটি ছবি (যা দেখা গেল তার ভিত্তিতে) আঁকলেন। আলোচনায় জানা গেল এই ফুটকি'র মত জিনিষটার নাম ভ্রূণ যার বিকাশ ও গতি লক্ষ্য করাই পরবর্তী পরীক্ষাগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য। যে সব ডিমে তা পাওয়া গেল না সেগুলি অনিষিক্ত (আনফার্টিলাইজড্) ডিম, অর্থাৎ এগুলি থেকে বাচ্চা হবে না (বাংলায় অনেক অঞ্চলে এগুলিকে 'বাওয়া' ডিম বলে)। সবাই এ ব্যাপারে তাঁদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করলেন। বেশ একটা উপভোগ্য আলোচনা'র সূত্রপাত হ'ল। ঘরময় গুঞ্জন—মানে ছোটবেলায় আমরা যাকে 'পিন-ড্রপ সাইলেন্স' বলতাম তার একেবারে উল্টো, এবং প্রশিক্ষকরা দুই ঠোঁটের সামনে আঙুল ধরে কথা থামান'র বদলে নিজেরাই সেই 'গোলমালে' যোগ দিলেন। বেশ খানিক্ষণ এ ধরণের সরব ভাব-বিনিময়ের মাধ্যমে জানা গেল যে অনেকেই লক্ষ্য করেছেন পোলট্রির ডিম থেকে নাকি সাধারণত বাচ্চা হয় না (ঠিক কি'না এই অধম সেটা বলতে পারবে না)। কারণ অনুমান করা গেল যে বেশী ডিম পাবার জন্য পোলট্রির মুর্গীদের (যারা সাধারণত সংকর জাতের হয়) সাথে পুরুষ মুর্গা (বা 'মোর্গা') সাধারণত থাকতে দেওয়া হয় না। দেশী মুর্গীরা স্ত্রী-পুরুষ মিলে হৈ চৈ করে ঘুরে বেড়িয়ে থাকে।

নতুন পরীক্ষা। কানা উঁচু পলিথিনের প্লেটে অল্প নুন মেশান জল (ওখানকার ভাষায় 'নিমক কা হাল্কা ঘোল'। সলিউশনের প্রতিশব্দ 'ঘোল' শুনে হঠাৎ বিচ্ছিরি ধরনের হাসির বেগ সামলাতে হয়েছিল। —আপনাদের ?) ঢেলে তার উপর ভাঙা কাঁচা ডিমের ভেতরের সব কিছু কাত করে ঢেলে দেওয়া হ'ল। তার আগেই অল্প কিছু স্বচ্ছ তরল পাদার্থ সবাই ড্রপারে তুলে একটা করে পরখ নলে রেখে দিয়েছেন। নুন-জল ব্যবহারের কারণ হিসেবে বলা হ'ল নুনজলের দ্রবণে (অর্থাৎ 'ঘোল'-এ) ভ্রূণ বেশীক্ষণ জীবিত থাকে ও তার জৈবিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। এই প্রসঙ্গে এই খবরটাও আলোচনার মধ্যে এল যে হাসপাতালে যে 'স্যালাইন ওয়াটার' রোগীর শরীরে ঢোকাতে অনেকে দেখেছেন তা মূলতঃ এই নুন জলের গোত্রীয়ই এবং শরীরের মধ্যে তার ভূমিকাও একই অর্থাৎ শরীরের কোষগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা। এবার শুধু চোখে বা প্রয়োজনে আতস কাঁচ দিয়ে সবাই নাড়িয়ে চাড়িয়ে প্লেটের উপর রাখা পদার্থগুলি ও ডিমের খোলার গায়ে লেগে থাকা ডিমরূপী এককোষী প্রাণীটির অন্যান্য কাঠামোগত উপাদানও (যেমন শৈলিষ্মক ঝিল্লি, রেচক পদার্থ জমা হওয়ার থলি ইত্যাদি) **স্বচক্ষে** দেখলেন। তার তালিকা, ছবি ইত্যাদি তৈরী করলেন এবং তাদের সম্ভাব্য ভূমিকা সম্পর্কে অনুমান ও আলোচনা করলেন।

অতঃপর সেদ্ধ ডিমটার খোলা ছাড়িয়ে তাকে লম্বালম্বি মাঝখান দিয়ে কাটা হ'ল। **এবার শুরু হ'ল** কাঁচা ডিম ও সেদ্ধ ডিমের ভেতরে দেখা জিনিষগুলির তুলনামূলক আলোচনা। কয়েকটা জিনিষের মধ্যে স্পষ্ট মিল দেখা গেল যেমন অর্ধ কঠিন হলুদ জিনিষটা সেদ্ধ ডিমে রং অপরিবর্তিত রেখে পুরো কঠিন হয়ে গেছে ; কাঁচা ডিমের খোলার গায়ে লেগে থাকা হাওয়ার থলির (আগে এটার উল্লেখ করতে ভুলে গেছি) জায়গাটা সেদ্ধ ডিমের মধ্যে ছোট গর্তের মত হয়ে গেছে, ইত্যাদি। পরখ নলে জমিয়ে রাখা স্বচ্ছ তরল পদার্থটা কেরোসিনের কুপিতে (এটা আনতে ভুল হয়ে গিয়েছিল। একজন প্রশিক্ষক দৌড়ে গিয়ে 'কিট্স রুম' থেকে যতগুলো টোলি ততগুলো কেরোসিনের কুপি নিয়ে এলেন) গরম করতেই দেখা গেল সেটা জমে গিয়ে **চোখের সামনেই** সেদ্ধ ডিমের সাদা শক্ত অংশটার চেহারা নিতে শুরু করল। স্পষ্টই বোঝা গেল সেদ্ধ ডিমের ঐ অংশটা সাদা অ্যালবুমেনই বটে। কিন্তু দুয়েকটা জিনিষ নিয়ে খট্কা বাধল। যেমন সেদ্ধ ডিমের এই লম্বালম্বি প্রস্থচ্ছেদে কুসুমের সবদিক ঘিরে (অর্থাৎ কুসুম ও সাদা অংশের মাঝখানে) একটা ঈষৎ কালচে রঙের সীমারেখা দেখা গেল। কাঁচা ডিমের কোন অংশটা তাপ দেওয়ার পর এই চেহারা নিয়েছে সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। অনেক আলোচনাতেও স্পষ্ট কোন জবাব বেরিয়ে এল না। প্রশিক্ষকরা অকপটভাবে স্বীকার করলেন, তাঁরাও বুঝতে পারছেন না। বইপত্র ঘেঁটে দেখবেন জবাব মেলে কিনা। আমি এখনও জানি না পরে এর উত্তর তাঁরা দিতে পেরেছিলেন কি'না।

ধারাবাহিক ডিমের নাটকে রীতিমত কৌতূহলী হয়ে উঠছিলাম, কাজেই খোঁজ রেখেছিলাম কবে আবার তার পরের দৃশ্য মঞ্চস্থ হবে। যথাদিনে, যদিও যথাসময়ে নয়, অর্থাৎ একটু দেরীতে, একই ক্লাসে হাজিরা দিলাম। দেখলাম 'যন্ত্রপাতি' ও উপকরণ বেঁটে দেওয়া হয়ে গেছে (হ্যাঁ, প্রতিদিনের পাঠ আদান প্রদানের শেষে যন্ত্রপাতিগুলি শিক্ষার্থীরাই এক জায়গায় জড়ো করেন ও প্রধানতঃ প্রশিক্ষকরা ভাগাভাগি করে সেগুলি কিট্স রুমে বয়ে নিয়ে যান। কখনও কখনও শিক্ষার্থীরাও তাতে সাহায্য করে থাকেন)। যন্ত্রপাতি মোটামুটি একই, উপকরণ বলতে প্রতিটি টোলি পেয়েছে প্রধানতঃ এক জোড়া করে তিন দিন ও সাত দিন ধরে তা' দেওয়া কাঁচা ডিম। অল্প দূরের বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীতত্ত্ব বিভাগে'র গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে তা দেওয়ার যন্ত্রে (ইনকিউবেটরে) কাজটা করে আনা হয়েছে। গ্রামে মুর্গীকে দিয়েই কাজটা সহজে করান যেতে পারে।

এবার কাজ হ'ল এক এক করে ডিম দুটোকে আগের দিনের মত সাবধানে খোলা খুলে নুনজলের দ্রবণে ভেতরের জিনিষগুলোকে ঢেলে দেওয়া এবং নিরীক্ষণ ও নথিবদ্ধ করা। তাই করা হ'ল। তিন দিনের তা' দেওয়া ডিমে দেখা গেল (আতস কাচ দিয়ে বা কোন কোন ক্ষেত্রে খালি চোখে আগের দিনের নিথর ফুটকি'র মত বিন্দুটির জায়গায় রীতিমত স্পন্দনরত আরও বড় আকারের রক্তিম একটা বিন্দু। এখানে উল্লেখ্য নিষিক্ত ডিমেই তা দেওয়া হয়েছিল। তবে বাইরে থেকে দেখে কিভাবে নিষিক্ত ডিম চেনা গিয়েছিল সেটা আমাদের সামনে কোন আলোচনা হয়নি। আমাদের জানা হয়নি। চাপা উত্তেজনাপূর্ণ গুঞ্জনে ঘর ভরে উঠল। বুঝলাম আমাদের মতই এঁদের কাছেও এ দৃশ্য সম্পূর্ণ নতুন। আলোচনায় জানা গেল উষ্ণতার ফলে নিষিক্ত ডিমের বিকাশ সবে শুরু হয়েছে এবং ঐ স্পন্দনরত বিন্দুটি অনাগত পক্ষী শাবকের হৃৎপিণ্ড। **প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের** ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা গেল শরীরের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডই সবার আগে জন্মায় এবং গোড়াতে তার উপর স্বচ্ছ একটা পর্দা (মেমব্রেন) ছাড়া অন্য কোন আবরণ থাকে না।

> **"এমনকি আনুষ্ঠানিকভাবে জীববিদ্যার শিক্ষণপ্রাপ্ত বন্ধুদের কাছে বর্ণনা করে দেখেছি, তাঁরাও রীতিমত উত্তেজিত বোধ করেছেন এবং জানিয়েছেন এই ভঙ্গীতে জীবনের বিকাশ প্রক্রিয়াকে এত কাছ থেকে নিরীক্ষণ করার অবকাশ তাঁদের শিক্ষাক্রমে ঘটেনি।"**

এবার সাতদিনের তা দেওয়া ডিম খুলে দেখা হ'ল। সরু মাংসল একটা গলার জন্ম হয়েছে। তার উপরে আবির্ভূত হয়েছে প্রকান্ড বড় বড় দুটো চোখ এবং তার নীচেই প্রায় ঠোঁটের আকারের সামান্য একটু বর্ধিত অংশ। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কোন কোনটির ক্ষেত্রে অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। কুসুমের সারা গা জুড়ে জন্ম হয়েছে অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত সুতোর মত লম্বা ও সরু সব বস্তু যা কুসুমটিকে অনিয়মিত রেখায় বোনা জালের মত ঘিরে রেখেছে। চোখে পড়ছে অনেকগুলোর রং গাঢ় লাল—কিন্তু কোন কোনটার রং সাদাটে বা সামান্য কালচে বা নীলাভ। কোন রঙের 'সুতো' সংখ্যায় বেশী ছিল বলতে পারব না। তবে ঔজ্জ্বল্যের জন্য লাল রঙের 'সুতোই' বেশী চোখে পড়ছিল। কুসুমের আয়তন চোখে পড়ার মত ছোট হয়ে গেছে আর একটা বড় স্বচ্ছ থলি স্পষ্টভাবে কুসুম থেকে বেরিয়ে এসে ডিমের স্বচ্ছ অ্যালবুমেন-এর মধ্যে ভাসছে। থলির নীচের দিকে হালকা সবুজ রঙের সামান্য কোন পদার্থ সঞ্চিত হয়ে আছে। প্রাণবন্ত জল্পনা কল্পনা, অনুমান, প্রশ্ন, আলোচনা শুরু হ'ল। মাঝে মাঝে প্রশিক্ষকদের কেউ না কেউ আলগাভাবে কিছু কিছু প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে (দেখা জিনিষগুলির সম্ভাব্য ভূমিকা ও তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই প্রধানতঃ) আলোচনার ধারাবাহিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা রাখতে সাহায্য করছিলেন। ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন সবারই ক্ষেত্রে ডিমের এই 'অপারেশন' সফল হয়েছে কিনা। না হলে সাহায্য করছিলেন। শিক্ষার্থীরাও পরস্পরকে সাহায্য করছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁদের অনেকেরই দক্ষতা প্রশিক্ষকদের চেয়ে কম মনে হচ্ছিল না। আমরাও নেহাত নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টার ভূমিকায় থাকতে পারি নি। ছড়ান ছেটান ভিড়ে দিব্বি মিশে গিয়ে চিমটে এগিয়ে দিয়ে, আতস কাঁচে চোখ রেখে একেবারে আনাড়ী লোকের পক্ষে যতটা সম্ভব অংশ নেবার চেষ্টা করছিলাম। এমনকি এ যাবৎ কাল স্বাদগ্রহণ ও গলাধঃকরণ ছাড়া ডিমের সাথে অন্য কোন সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও (একটু ভুল হল বোধ হয়; ছোট বেলায় ক্লাশ থ্রি কি ফোরে দোয়েল, কোয়েল, ফিঙে, উটপাখী এসব পাখীর ডিমের আকার আয়তন ও রং কষে মুখস্ত করে ছিলাম বলে মনে পড়ছে যেন, যদিও চর্মচক্ষে হাঁস মুরগি বাদ দিলে পায়রা, টিকটিকি আর আরশোলার ডিম ছাড়া আর কোনও ডিম কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না) এবং হিন্দীর দৌড় লজ্জাকরভাবে সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও (ক্লাসের সব আলোচনাই হিন্দীতে চলত) মহোৎসাহে অর্বাচীন মতামত দেওয়ার লোভ সামলাতে পারিনি।

সরগরম বাদ-বিতন্ডার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত স্পষ্টই বেরিয়ে এল যে প্রয়োজনীয় উষ্ণতা পেয়ে (অর্থাৎ এমনি ফেলে রাখলে বা গরম জলে ডুবিয়ে রাখলে উষ্ণতা প্রয়োজনের নিম্ন-বা উর্ধ্বসীমার মধ্যে থাকত না) ভ্রূণটি দ্রুত পক্ষী শাবকের দিকে এগিয়ে চলছিল (অবশ্য আর চলবে না, কারণ যে নিরাপদ আশ্রয়ের অঙ্গীভূত ছিল সে তাকে আমরা স্থায়ীভাবে ভেঙে ফেলেছি ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের আগেই নিষ্করুণ পরিবেশের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছি)। সে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংগ্রহ করেছে ওই কুসুম থেকে (কাজেই কুসুম ছোট হয়ে গেছে। সংগৃহীত হয়েছে ঐ সুতোর আকারের লম্বা বস্তুগুলোর মাধ্যমে)। অর্থাৎ ওগুলোই হল নবজন্মপ্রাপ্ত শিরা উপশিরা (যেগুলোর রঙ ঘন লাল) ও ধমনী। বোঝা গেল জীবনের বিকাশের প্রক্রিয়ায় কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি ও পৃথকীকরণ (অর্থাৎ একই চেহারার কোষ থেকে সম্পূর্ণ নতুন নতুন কোষের চেহরার কোষের জন্ম) একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—গলার মাংস; চোখ, শিরা উপশিরা ও তার মধ্যেকার রক্তবহা কণিকাগুলি সবই ভিন্ন ভিন্ন ধরণের কোষ দিয়ে তৈরী। পুষ্টিকে শরীরের অঙ্গীভূত করে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন (এই প্রয়োজনের কথাটা বই থেকে জানা গেল, পরীক্ষা থেকে নয়) যে ডিমের মধ্যে প্রথম দিন লক্ষ্য করা হাওয়ার থলি থেকেই পাওয়া যাচ্ছে সেই অনুমান যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত বলে সবাই একমত হলেন এবং বই থেকে জানা গেল, অনুমান যথার্থই। স্বচ্ছ থলিতে সঞ্চিত সবুজ রঙের পদার্থটা যে বিকাশরত পক্ষীশাবকের (হ্যাঁ, এখন বোধ হয় ভ্রূণের বদলে পক্ষীশাবক বলা যেতে পারে) শরীরের বর্জ্য পদার্থ (যা নিরাপদে থলির মধ্যে সংরক্ষিত থাকায় ডিমের অন্য অংশের

সংস্পর্শে এসে আভ্যন্তরীণ 'পরিবেশ দূষণ'-এর সুযোগ পাচ্ছে না) এ অনুমানও সঠিক বলে জানা গেল। প্রতিটি স্তরেই উপযুক্ত নামকরণ সহ সমস্ত অংশগুলির ছবি আঁকা চলেছে। পরের কোন এক দিন যবনিকার অন্তরাল থেকে নতুন দৃশ্য উন্মোচনের প্রতীক্ষা নিয়ে ক্লাস শেষ হল।

অতঃপর **তৃতীয় ও শেষ পরীক্ষার দিন**। এবারে দশ দিনের তা' দেওয়া ডিমের শক্ত আবরণ ভেঙে ফেলা হ'ল। দেখা গেল শাবকের দেহের মূল অংশ রীতিমত প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তার নির্ণিয়মান প্রত্যঙ্গগুলির ভিতরে লুকিয়ে থাকা হাড়ের কাঠামো'র উপস্থিতিও খুবই স্পষ্ট (আগের দিন এত স্পষ্ট ছিল না)। আগের দিনের আভাসমাত্র উপস্থিত ঠোঁট রীতিমত শক্ত পাখীর ঠোঁটের চেহারা নিয়েছে। চোখদুটি আজও আগের দিনের মতই শরীরের অন্য প্রত্যঙ্গগুলির তুলনায় বিসদৃশভাবে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে। হৃৎপিণ্ড শরীরের কোথাও সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। পুষ্টিদায়ী কুসুমাংশটি আরও ছোট ও বর্জ্য পদার্থের সংগ্রাহক রেচক থলিটি সবুজ রঙের পদার্থে আরও স্ফীত। আগের দিন যেটাকে যেকোন পাখীর ছানা বলে মনে হতে পারত আজকে তার মধ্যে মুরগীর ছানা'র আদালটি খুবই স্পষ্ট। অর্থাৎ আগের দিনের পরিলক্ষিত জীবনের প্রক্রিয়া আরও অগ্রসর হয়েছে (আমার মত অন্যমনস্ক পাঠককে আবার মনে করিয়ে দেওয়া অসঙ্গত হবে না যে মুর্গী ছানা'র বিকাশের বিভিন্ন স্তর ভিন্ন ভিন্ন ডিমেই দেখা চলছে। যে কোন স্তরকে দেখার জন্য কোন ডিমকে উন্মুক্ত করার অর্থই তার মৃত্যু)। যেটা বিশেষভাবে নজর কাড়ল তা হচ্ছে নবজন্ম প্রাপ্ত দেহের মূল অংশের সামনে ওপরের দিকে একই আনুভূমিক রেখায় একজোড়া ও তার একটু নীচে এরই সমান্তরাল আর এক জোড়া অবিকল এক চেহারার ভোঁতামুখো ছোট ছোট প্রত্যঙ্গ শরীর থেকে সামনে বেরিয়ে এসেছে। কারা এরা? জন্মের পর মুর্গীর ছানার চেহারা সম্পর্কে পূর্ব-দৃষ্ট অভিজ্ঞতা থেকে এই অনুমান (অনেক বিশ্লেষণ ও জল্পনা কল্পনা'র পরে) যথেষ্ট সঙ্গত বলে মনে হ'ল যে এখন দেখতে একরকম হলেও উপর ও নীচের জোড়ার ভবিতব্য একরকম নয়। উপরের জোড়া ডানাতে ও নীচের জোড়া ঠ্যাং-এ (হ্যাঁ, যার রূপ ধ্যান করা মাত্রই অনেকের মুখের ভিতর আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে। বর্তমান নিবেদক অবশ্য ও রসে বঞ্চিত। কাজেই কল্পনার সুখ ও আশু বাস্তবের বঞ্চনা এ দু'য়ের কোন অভিজ্ঞতাই তার হয় নি।) রূপান্তরিত হতে চলেছে। ভ্রূণ থেকে পূর্ণাবয়বে পরিণতির সময়কালে প্রাণী মাত্রেই যে পৃথিবীর বুকে অতীত জীব বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরগুলি দ্রুতলয়ে ছুঁয়ে যায় এবং এভাবেই বর্তমানের পটে বিম্বিত সুদূর অতীতের বিকাশমান জীবনের রূপরেখাকে বুঝতে সাহায্য করে সেই আলোচনা প্রাসঙ্গিক ভাবেই চলে এল। সদ্যোন্মুক্ত ডিম চোখের সামনে রেখে সেই আলোচনা যে মূর্ত ও বিশ্বাসযোগ্য এবং তার ফলেই গ্রহণযোগ্য রূপ নিতে পারল তা নিছক বইয়ের ছবির 'বিবর্তন-বৃক্ষ' সামনে রেখে হওয়া মুস্কিল বলেই আমাদের মনে হ'ল। একটা বেশ মজার সমস্যা নিয়ে আলোচনা উঠল। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকেই কেউ প্রশ্নটা তুললেন। অসম্পূর্ণ অবয়বের মুর্গির ছানার শরীরে চোখ দুটো অত বড় কেন? কই জন্মের পর তো ওরকম লাগে না? এমনকি পূর্ণ আকারের মুর্গীর (বা 'মোর্গা'র) চোখও তো ওর চেয়ে ছোট বলে মনে হয়। তবে কি শরীরের অন্য প্রত্যঙ্গগুলি যেখানে বেড়ে চলে সেখানে চোখের বেলায় কোন এক উল্টো প্রক্রিয়ার ফলে সেটা ছোট হতে থাকে? সবাই অবশ্য বুঝলেন, তা হয়ত সম্ভব নয়। মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে আসা গেল যে, যে কোনও কারণেই হোক চোখের জন্ম ও বৃদ্ধি গোড়াতে অনেক তাড়াতাড়ি হয়। পরে শরীরের অন্য অংশগুলির বৃদ্ধির হার চোখকে ধরে ফেলে ও ছাড়িয়ে যায়। পূর্ণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত শরীরে চোখ আর আনুপাতিক ভাবে অত বড় দেখায় না।

ডিম, ভ্রূণ আর মুর্গীর ঠ্যাঙের **পরীক্ষা এখানেই শেষ**। পূর্ণাবয়ব পক্ষী শাবক অপ্রয়োজনীয় মনে করে আর দেখানো হয় নি। পর পর তিনদিন ধরে পরীক্ষা চলে নি। তিন সপ্তাহের ছড়ান ছেটান বিভিন্ন দিনে পরীক্ষা চলেছে। এই পরীক্ষামূলক পাঠ দানের (বা আরও ঠিক কথায় আদান প্রদানের) বিষয় শিরোনামা ছিল 'বিকাশ'—**অর্থাৎ জীবনের বিকাশ**; ডিম, পাখী বা ভ্রূণের নয়। একই শিরোনামায় উদ্ভিদ জীবনের বিকাশের উদাহরণ হিসেবে বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম তথা চারায় পরিণতির কয়েকদিন জোড়া পরীক্ষা আমরা চলতে দেখেছি যদিও ধারাবাহিক ভাবে সেই ক্লাশগুলিতে উপস্থিত ছিলাম না। বিষয়টা সপ্তম মানের পাঠ্য বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বলাবাহুল্য বর্তমান পরীক্ষাটা আমাকে অত্যন্ত উৎসাহিত প্রায় উত্তেজিতই করেছিল বলা যায়। এমনকি আনুষ্ঠানিকভাবে জীববিদ্যার শিক্ষণপ্রাপ্ত বন্ধুদের (যা বর্তমান প্রতিবেদক নয়, কাজেই উপরের বিবরণে যদি কিছু দেখার বা শোনা'র ভুল থেকে গিয়ে থাকে তা সংশোধিত হলে কৃতজ্ঞ থাকব) কাছে বর্ণনা করে দেখেছি তাঁরাও রীতিমত উত্তেজিত বোধ করেছেন এবং জানিয়েছেন এই ভঙ্গীতে জীবনের বিকাশ প্রক্রিয়াকে এত কাছে থেকে নিরীক্ষণ করার অবকাশ তাঁদের শিক্ষাক্রমে ঘটেনি। পাঠকদের প্রতিক্রিয়া কি জানবার বাসনা রইল। তবে যদি সেরকম না হয়ে থাকে তো সে আমার কইবার 'গুণে'।

প্রশিক্ষণ পর্বে শিক্ষকরা যে পাঠ আদান-প্রদানের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেলেন তাঁদের শিশু ও কিশোর ছাত্র ছাত্রীরাও যাতে একই ধরনের প্রক্রিয়ার শরিক হতে পারেন সেটা যথাসম্ভব সুনিশ্চিত করাই তাঁদের কাজ। বাস্তবে কতটা তাঁরা করেন বা করা সম্ভব হয় সে প্রশ্ন থেকেই যায়। আমরা যখন গেছি তখন গরমের ছুটি-গোড়াতেই বলেছি এ সময়েই প্রশিক্ষণ চলে।

(শেষ অংশ কুড়ি পৃষ্ঠায়)

একুশ শতাব্দীর লক্ষ পথে
প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের সফল প্রয়োগ :
কম্পিউটার যুগে উত্তরণ—মহাকাশ অভিযান
সমুদ্রে মন্থন, আন্টার্কটিকার দুঃসাহসিক অভিযান—
সর্ব্বত্রই আমাদের সফল পদসঞ্চার...বৈপ্লবিক রূপান্তরের
এক জোয়ার এসেছে—নতুন যুগের রাঙা প্রভাতের
আগমন বার্তা ধ্বনিত হচ্ছে
সাদরে তাকে বরণ করে নিতে হবে—
তাই সুরু হয়েছে আমাদের প্রস্তুতি...
বিজ্ঞান আর শিল্পায়ণের মাধ্যমে দারিদ্র আর সকল সমস্যার
সমাধান আমরা করবই—
আর ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে যাব সেই নতুন যুগের ঊষালগ্নে
davp 85/430

বিদেশবিমুখ প্রসূন শেষপর্যন্ত গবেষণা করতে বিদেশে গেল.....বন্ধু স্বরূপের 'খোঁচা' খেয়ে প্রসূন তুলে ধরে তার কিছু অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি।

বিজ্ঞানচর্চার এদেশ ওদেশ

স্বরূপ গুপ্ত

প্রসূনকে আমি অনেকদিন থেকেই চিনি। ফিজিক্সের ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল। বি. এসসি-তে ও এম. এসসি-তে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হয়েও প্রসূন কিন্তু ওরই অনেক সহপাঠীর মত বিদেশে যাবার জন্য মরীয়া তো হ'লই না, কোন চেষ্টাই করল না। এখানেও প্রথমে রিসার্চ করতে চাইল না, পরে অবশ্য পি. এইচ ডি-টা করে ফেলল একসময়। কিন্তু তারপরও ওর ভোল পাল্টাবার লক্ষণ দেখা গেল না। একটা কলেজে শিক্ষকতা করছিল, পরে কিছুদিন একটা নামকরা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ করল, তারপর আবার, কেন কে জানে, ফিরে গেল কলেজে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষকরা সবাই বলে—প্রসূনটা পাগলা, কত কী করতে পারতো, কিন্তু সেদিকে ওর নজর নেই। ঘনিষ্ঠ কেউ কেউ বলতো—জীবনটা এভাবে নষ্ট করো না, একবার বিদেশ-টিদেশ ঘুরে এসো। এদেশে থেকে কী করবে? প্রসূন কখনও হেসে পাশ কাটাতো। কিন্তু কারও কারও কাছে মুখ খুলতো —কী হবে বিদেশ গিয়ে? ওদেশে শেখা বিদ্যা যদি এদেশের কোন কাজে লাগতো তাহলে এতদিনে এদেশের চেহারা অন্যরকম হ'তো। ইউনিভার্সিটিগুলোতে তো ডজন ডজন বিদেশী ডিগ্রিধারী বিজ্ঞানী রয়েছে—তারা কি দিতে পারছে দেশকে? বিদেশে গিয়ে বিজ্ঞানের সেবা করব, ফিরে এসে দেশের উন্নতি করব—এসব গালভরা কথা, আসলে ফাঁকিবাজি, পলায়নী মনোবৃত্তি। এখানে থেকে অবস্থার উন্নতির জন্য সংগ্রাম কেউ করতে চায় না—স্বার্থপর সুখের সন্ধানে পালাতে চায়। ...মুখে যে যাই বলুক আসল উদ্দেশ্য টাকা কামানো, তা নাহ'লে শুধুমাত্র ইউরোপ-আমেরিকার ধনী দেশগুলোতেই এত যাবার হিড়িক কেন? ওরা পয়সা দিয়ে কিনে নিতে চায় আমাদের। ...তাছাড়া একবার সুখের অর্থের স্বাদে অভ্যস্ত হ'লে, ফিরে আসা দুষ্কর। যদিও বা ফেরে, মন উড়ু উড়ু করতেই থাকে, চারপাশ সম্পর্কে উদাসীন হ'য়ে পড়ে। সুযোগ এলে আবার পাড়ি। বিদেশের সঙ্গে যার যত যোগাযোগ, দেশের মানুষ আর মাটির সঙ্গে যার যোগ যত ক্ষীণ সে হয়ে ওঠে তত বড় বিজ্ঞানী; দাস মনোবৃত্তি আমাদের মজ্জায় মজ্জায়...

এহেন প্রসূন বিদেশ ঘুরে এলো। জার্মানীর ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনষ্টিটিউটে কী যেন একটা বৃত্তি নিয়ে গবেষণা করে এলো একবছর! মনে মনে একটু অসৎ উদ্দেশ্য নিয়েই একদিন গেলাম প্রসূনের সঙ্গে দেখা করতে।

* * *

দেখা হতেই হৈ হৈ অভ্যর্থনা জানাল প্রসূন। চা-সিগারেটের সদ্ব্যবহার করতে করতে এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন লাগল জার্মানী, ওখানকার রিসার্চ? খুব আস্তে আস্তে একটা একটা ক'রে প্রশ্নের উত্তর দিল প্রসূন—জার্মানী তো তেমন দেখিনি যে মন্তব্য করব। রিসার্চও তথৈবচ। তবে একটা অভিজ্ঞতা হল, অন্য এক জগতের। পড়া-শোনা আর দেখায় বিস্তর ফারাক। থেমে গেল প্রসূন। ওকে একটু উস্কে দেবার জন্য আবার প্রশ্ন করি—বিদেশ যাওয়া সম্পর্কে তোমার ধারণা তাহলে পাল্টে গেছে?

জায়গামত আঘাত পড়েছে বোঝা গেল। প্রসূন জোরের সঙ্গে উত্তর দিল—না, পালটায় নি, বরং আরও দৃঢ় হয়েছে; শুধু ডিটেল-এ একটু সমৃদ্ধ হয়েছে।

—কি রকম?

—রিসার্চের ব্যাপারটা নিয়েই বলি। এবার প্রসূন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে যায়—ওদের গবেষণা যে উন্নতমানের ও ফলপ্রসূ তা তো আমরা শুনেই আসছি ছোটবেলা থেকে। কিন্তু এ সাফল্যের কারণ কি জানো? প্রথমতঃ, বিজ্ঞান ওদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, প্রত্যেকেই বিজ্ঞানের প্রভাব অনুভব করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস, আস্থা ও মর্যাদা বোধ। এমনকি আমি যে আমি এক অজ্ঞাতকুলশীল ভারতীয় ওখানে যাওয়ামাত্র বিভাগীয় প্রধান আমাকে নিয়ে গোটা ডিপার্টমেণ্ট ঘুরে দেখালো। কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল এবং ষ্টোর-কীপারের কাছ থেকে নিয়ে আমার হাতে তুলে দিল এক জোড়া চাবি—তার একটায় বাড়ীটায় ঢোকার মূল দরজা খোলে, অপরটা একটা মাস্টার-কী, ষ্টোর এবং লাইব্রেরী বাদে বিভাগের সমস্ত ল্যাবরেটরী মায় প্রধানের ঘরের দরজা পর্যন্ত খোলা যায়। এবং আমি প্রয়োজনে সারারাতও একা একা কাজ করেছি। এই আস্থা ও বিশ্বাস প্রতি পদে। ফলে সহযোগিতার মনোভাব প্রচণ্ড এবং মিলেমিশে একটা বিরাট কাজ অনায়াসে করে। তৃতীয়তঃ, ওখানে বিজ্ঞান প্রযুক্তির এমন কোন গবেষণাপ্রকল্প খুঁজে পাওয়া দুষ্কর—যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নয়। আপাতদৃষ্টিতে খুবই তাত্ত্বিক, এমন বিষয়েও গবেষণার জন্য বেসরকারী শিল্প টাকা দিচ্ছে। প্রাইভেট কোম্পানিও ওদেশে বিজ্ঞান প্রযুক্তির তাত্ত্বিক বই প্রকাশ করে এমনকি জার্নালও, ভাবতে পারো? চতুর্থতঃ, বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে ওরা মূলত করে এবং শেখে, শেখে এবং করে; প্রথমে কাজ, অভিজ্ঞতা পরে তত্ত্ব, আমাদের মত শুধু পড়ে শেখার কসরৎ নয়। নতুন বিষয়, নতুন বিশ্লেষণ নিয়ে নিত্য কত না বই বেরোয় ওদেশে, সেগুলো ওদের কাজ ও অভিজ্ঞতার ফসল। আমরা বেশী দাম দিয়ে সেসব বই কিনে শুধু বই পড়েই ওদের মত বিজ্ঞানের প্রথম সারিতে কাজ করতে চাই। পঞ্চমতঃ, সেটা সবাই বলে, জানে—ওদের কাজের জন্য চারপাশের সাহায্য ও ব্যবস্থা সর্বদা পাওয়া যায়, আমাদের মত পদে পদে আটকে পড়তে হয়না। আমি প্রসূনকে বাধা দিয়ে বলি—কিন্তু তোমার ধারণা পাল্টায়নি বলছিলে যে তুমি?

—হ্যাঁ আমার মনে আছে সেকথা। প্রসূন আমাকে নিরস্ত করে বলতে থাকে—আমরা ওদেশে গিয়ে সাধারণত ওদের কাজের বাইরের সংগঠিত চেহারা ও ফসলটাই দেখি, দেখিনা কীভাবে ধীরে ধীরে কতনা সূক্ষ্ম প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বড় বড় কাজ ইভলভ্ করে। এই ধরো আমি য যন্ত্রটায় কাজ করে এলাম—সেটা এখনও কোন পূর্ণাঙ্গ যন্ত্র নয়। ওরা ওদের ল্যাবরেটরীতে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উন্নতির মধ্য দিয়ে একটা পরীক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে—দশ বছর ধরে। ক্রমশঃ ব্যবস্থাটা একটা পূর্ণাঙ্গ, খুবই কার্যকরী ও নিখুঁত রূপ পেয়েছে। উচ্চ তাপমাত্রায় ও চাপে পদার্থের নানা পরিবর্তন তাতে এখন সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা যায়। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় সেকেন্ডে দশটা পর্যন্ত রিডিং নিতে পারা যায় যেটা ম্যানুয়ালি করা যেতো না আগে। ফলে দ্রুত যে সব পরিবর্তন ঘটে, যেগুলো আগে ধরা বোঝা যেতো না এখন যায় এবং এই সংক্রান্ত কাজে এসেছে একটা নতুন ডাইমেনশন। এই যে পরীক্ষার ব্যবস্থা এটা এখন একটা কমপ্যাক্ট যন্ত্র হিসেবে বাজারে চালু করার জন্য ইনষ্টিটিউট একটি কমার্শিয়াল যন্ত্রাদি তৈরীর কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, শীগগীরই সেটা বাজারে আসবে। দাম হবে ধরো অন্তত লাখ দশেক মার্ক। এখন আমি যদি এদেশে সরকারী টাকা ম্যানেজ করে ঐ যন্ত্রটা কিনি হয়তো কিছুদিন ওটা দিয়ে ওখানে কাজ শেখার দৌলতে এখানে আমি কিছু পেপার করলাম। তারপর হয় ওটা অকেজো হবে, নয় আমি একজায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে শুকিয়ে যাবো—এমনি করে আমরা যে কত অপচয় ঘটাচ্ছি। চালু যন্ত্রকে চালাতেই আমি জানি, ত্রুটি হলে তা ধরার ক্ষমতা আমার নেই, চারপাশে সাহায্য করারও কেউ নেই। কেউ একজন তো আর যন্ত্রটা তৈরী করেনি, বহুজনের দীর্ঘ দিনের সাধনার ফসল সেগুলো। ওরা তো আমাদের তুলনায় কত ধনী, অথচ অপচয় রোধ ওরা কত যত্নশীল: পুরনো নতুন মিলিয়ে একটা বিভাগে পাঁচটা বিভিন্ন বয়সের, মডেলের ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ রয়েছে—আশ্চর্য হবে, পাঁচটাই কাজ করছে। প্রয়োজন অনুযায়ী ওরা উপযুক্ত যন্ত্রটা ব্যবহার করে—মশা মারতে কামান দাগার মত যেখানে পুরনো, কম সূক্ষ্ম যন্ত্রে কাজ চলে, সেখানে অত্যাধুনিক দামী ও সূক্ষ্ম যন্ত্রটাকে যন্ত্রণা দেয় না। তা যা বলছিলাম। ওদেশে গিয়ে ওপর ওপর দেখে মুগ্ধ হয়ে ফিরে এসে ওদের মত করে কাজ করার ব্যর্থ প্রয়াস চালাই আমরা। ভেতরে তাকিয়ে দেখার ইচ্ছা, ক্ষমতা, দৃষ্টিভঙ্গী ও মোটিভ কোনটাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে থাকে না। কারণ তা থাকতে গেলে দেশকে আগে একটু চেনা জানা প্রয়োজন। চীনের বিজ্ঞানীরা এখন পশ্চিম থেকে কারিগরী নিতে উদ্যোগী হয়েছে। ওরা কে কি শিখবে কেন শিখবে তা নিয়ে রেগুলার আলোচনার জন্য সরকারী অফিসার ও বিজ্ঞানীরা বিদেশে শিক্ষারত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে দেখা করে। ···প্রসূন একটু থামে। আমিও আর ওকে ঘাঁটাই না। একটু পরে ও আবার শুরু করে—ওদের বিজ্ঞানের ক্রাইসিস বা সংকটের চেহারাটাও আমাদের মোহগ্রস্ত চোখে ধরা পড়ে না। মানবিক সম্পর্কের সংকট, কম্পিউটারের সামাজিক ফল আউট, পরিবেশ দূষণ ও পরমাণু যুদ্ধের সম্ভাবনা আমাদেরকে এখনও বিচলিত করে না। ওদের পথে চলতে গিয়ে আমরা সেগুলো আমদানি করছি, সংকটে পৌঁছানোর পথটা ওদের জানা, প্রয়োজনে ওরা হয়তো সাবধান হয়ে প্রতিরোধ করতে পারবে—আমাদের পক্ষে তা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। ওদের পথে ওদের যন্ত্রে আমরা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছি। পড়বও; ওটা আমাদের পক্ষে পরাজয়ের পথ। আমি আর থাকতে না পেরে বললাম—মূল প্রশ্নটায় তোমার বক্তব্য আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। একটা তির্যক ছোট্ট হাসি খেলে গেল প্রসূনের মুখে, বলল—তোমার খোঁচাটা আমার মনে আছে; তুমি তো তাও রেখে ঢেকে বলেছ আর এক বন্ধু বলেছিল—আমেরিকা যাচ্ছ কবে? এবার নিশ্চয়ই তিন বছরের প্রোগ্রাম নিয়ে যাবে? না, তোমাদের দোষ নেই। আমার পক্ষে বাইরে যাওয়া সুখের হয়নি—মনের দিক থেকে আমি আরও অশান্তিতে পড়েছি। এখানে এসে যোগ দিয়েছি শুভ'দের বিজ্ঞান-সমিতিতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নিজেদের পথ নিজেদেরই করে নিতে হবে আমাদের; ভাত-কাপড়ের সমস্যার সমাধানের কংক্রীট কাজ থেকেই উঠে আসবে বিজ্ঞানের বড় বড় আবিষ্কার। বিদেশ দেখা সেখানেও প্রেরণা যোগাতে পারে। ওদের স্পিরিট এবং পদ্ধতি থেকে বহু উপকরণ পাবার আছে অবশ্য···

প্রসূনকে আঘাত করেছি বলে দুঃখ প্রকাশ করে আমি চলে এলাম, ভাবতে ভাবতে। □

With best Compliments from:

Sri Pratul Kumar Purkait

Contractor

P. O. Diamond Harbour

24-Pargana

বৈজ্ঞানিক অবদানে তো বটেই, মানবতাবোধের নিরিখেও—বিজ্ঞানচর্চা আর মানবিক সত্তার সমন্বয়ে—এ শতাব্দীর বিরল মানুষদের একজন নীলস্ বোর। গতবছর পূর্তি হ'ল তাঁর জন্মের শতবর্ষ। বোরের জীবন ও ব্যক্তিত্বের নানান দিকের পরিচিতি।

জন্মশতবর্ষে, নীলস্ বোর স্মরণে

সুব্রত ভট্টাচার্য্য

আরম্ভের আগে

'বিজ্ঞানী' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশেষভাবে জ্ঞানী। আর, জ্ঞান বা বিদ্যা আসলে মানুষকে যা দেয় বা দেবার কথা তা হল বিনয়—অবশ্যই যৌক্তিক বিনয়। আর, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিনয়—এ তিনটি ভাবধারা ও বিষয় যুক্ত করলে পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে যে কয়েকজনের নাম মনে পড়ে তাঁদের প্রথম সারির একজন হলেন নীলস্ বোর। তাই, তত্ত্বীয় ক্ষেত্রে অনেক চিন্তাগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তাঁর সম্পর্কে বলেছেন—"তিনি এমনভাবে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন যে মনে হয় তিনি সবসময়ই কিছু না কিছু হাতড়ে বেড়াচ্ছেন এবং কখনই তেমন কট্টর ভংগীতে কিছু বলেন না যা থেকে কোনমতে মনে হতে পারে যে একটি সুনির্দিষ্ট সত্য তাঁর হাতের মুঠোয়…।" এ বিনয়ী মনোভাবের সংগে, তাঁর বিরল প্রতিভার সংগে, সমন্বিত হয়েছিল এক পরিপূর্ণ মানবতাবোধ এবং আমাদের কাছে সবার উপরে সত্য এই মানুষ, বিজ্ঞানী নীলস্ বোর। হ্যাঁ, 1922 সালে নীলস্ বোর কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যায় তাঁর অসামান্য বিপ্লবী অবদানের জন্য 'নোবেল' প্রাইজ পেয়েছিলেন একথা ঠিক, এবং নোবেল প্রাইজ পাওয়া মানে বিজ্ঞানী হিসেবে বিরাট সম্মান, স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা পাওয়া নিশ্চয়ই; তবে কয়েকটি কথা এখানে প্রাসঙ্গিক। এক, কৃতী হওয়া মানেই সবসময় (জীবদ্দশায় বা মরনোত্তরও) স্বীকৃতি পাওয়া নয় এবং অনেকক্ষেত্রেই এ দুয়ের ভেতর ব্যবধান দুস্তর। দুই, 'নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি' নামক স্বীকৃতিটি কিন্তু কোনদিনই নিছক জ্ঞানচর্চার পরিধির ভেতর আবদ্ধ ছিলনা—এখন তো আরো নেই—কারণ পুরস্কার-নির্ণায়কদের রুই-কাতলারা যুক্ত বিশ্বরাজনীতির ঘোলাজলের সঙ্গে। তাই অনেকসময়ই দেখা যায়, পুরস্কার দানে নীতির চেয়ে রাজনীতির প্রভাবই বেশি ক্রিয়াশীল। সুতরাং এ ব্যাপারে অনেকটাই নির্মোহ হওয়ার দিন এসেছে আজ। যাই হোক, যেহেতু তাঁর মননশীলতায় নীলস্ বোর বিজ্ঞান ও বিবেকের দীপশিখা দুটি সবসময়ই পাশাপাশি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন তাই তিনি বিরাগভাজন হয়েছিলেন অনেক সময়ই অনেক প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিবর্গের। কিন্তু বোর তাতেও ছিলেন অনড়, অনমনীয়। বোর সম্পর্কে যুদ্ধবাজ চার্চিলের অপছন্দের মাত্রাটা লক্ষ্য করুন—"প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং আমি প্রফেসর বোর সম্পর্কে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তিনি এসব কাজে (প্রশাসনিক এবং নীতিনির্মানকাজে—লেখক) এলেন কী করে! (নিউক্লিয়ার অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে) উনি দেখছি সবকিছুই ফাঁস করে দেবার মস্ত সমর্থক। উনি বলছেন যে উনি রাশিয়ায় তাঁর এক বন্ধু অধ্যাপকের সঙ্গে এ সব বিষয়ে খোলাখুলি মত বিনিময় করবেন এবং তিনি অকপটে বলছেন যে সবসময়ই তিনি সেই বন্ধুর সংগে (প্রসঙ্গ ক্যাপিৎজা-বোর সম্পর্ক—লেখক) যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। এ সব কী কাণ্ডকারখানা চলছে! মনে হচ্ছে, হয় বোরকে আটক রাখতে হবে, না হয় যেভাবে হোক এটা অধ্যাপক বোরকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তিনি যেভাবে চলতে চাইছেন তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আমি আগে এসব কিছুই আঁচ করতে পারিনি—যদিও তুমি যখন ডাউনিং স্ট্রীটে মাথাভর্তি ঝাঁকড়াচুলো অধ্যাপকটির সংগে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে তখন আমি ওকে পছন্দ করিনি….এবং এখন যা ঘটেছে তা কিন্তু একেবারেই আমার মনঃপূত নয়।" চার্চিলের এ অপছন্দই বোধ হয় ব্যক্তি বোরের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রশংসাপত্র এবং তাঁর বিবেকী জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও কাণ্ডজ্ঞানের সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞান। প্রথম সাক্ষাৎকারে বোর সম্পর্কে তার অপছন্দের কথা চার্চিল যথেষ্ট তিক্ততার সঙ্গেই বলেছিলেন। আর বোর এই সাক্ষাৎ শেষে চার্চিলের ঘর থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের শুধুমাত্র বলেছিলেন—"We did not speak the same language" (অর্থাৎ আমাদের কথা বলার ভাষা

"প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং আমি প্রফেসর বোর সম্পর্কে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তিনি এসব কাজে (প্রশাসনিক এবং নীতিনির্মানকাজে—লেখক) এলেন কী করে! (নিউক্লিয়ার অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে) উনি দেখছি সবকিছুই ফাঁস করে দেবার মস্ত সমর্থক। উনি বলেছেন যে উনি রাশিয়ায় তাঁর এক বন্ধু অধ্যাপকের সঙ্গে এ সব বিষয়ে খোলাখুলি মত বিনিময় করবেন এবং তিনি অকপটে বলছেন যে সবসময়ই তিনি সেই বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। এ সব কী কাণ্ডকারখানা চলছে! মনে হচ্ছে, হয় বোরকে আটক রাখতে হবে না হয় যেভাবে হোক এটা অধ্যাপক বোরকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তিনি যেভাবে চলতে চাইছেন তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।"

দুটি ছিল আলাদা—যার অর্থ, দৃষ্টিভংগীর পার্থক্য)। যার যার উক্তি থেকেই প্রতিভাত হয় দুটি মানুষের ব্যক্তিত্বের উপাদান-বিভিন্নতার দিকটি।

নীল্‌স্ বোর : জন্ম ও জীবন

1885 সালের 7ই অক্টোবর কোপেনহেগেনে জন্মগ্রহণ করেন নীল্‌স্ বোর। বাবা ক্রিশ্চিয়ান বোর ছিলেন কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যার প্রথিতযশা অধ্যাপক। মায়ের নাম এলেন অ্যাডলার (বিয়ের আগের উপাধি) এবং এই অ্যাডলার পরিবারের অনেকেও ছিলেন শিক্ষার সঙ্গে শুধু যুক্ত নয়—একেবারে সম্পৃক্ত। তাই বোরের ধমনীতে ও রক্তের ধারায় বয়ে গিয়েছিল এক শিক্ষা জাগতিক বোধ ও আবহ—যার জন্যেই বোধ হয় শুধু নীল্‌স্ বোরই নন, তাঁর ছোট ভাই হ্যারল্ডও হ'য়েছিলেন পরবর্তী জীবনে এক নামকরা গণিতজ্ঞ এবং গণিত অধ্যাপক। শুধু লেখাপড়ায় নয়,—খেলাধুলোয়ও দুই ভাই-ই ছিলেন সমান আগ্রহী ও পারদর্শী। তাই, দুজনেই ছিলেন স্বাস্থ্যে সতেজ, মনে সজীব ও প্রফুল্ল।

নিজের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, দু'জনের মেজাজের বনিবনা হ'ল না। বোর 1912 সালে ম্যাঞ্চেস্টারে, চলে এলেন রাদারফোর্ড-এর কাছে—যিনি ছিলেন আরেক দিকপাল। মাত্র চার মাসে (মার্চ-জুলাই 1912 সাল) বোর সেখানে অনেকটা এগিয়ে গেলেন তাঁর প্রশ্নের মীমাংসায়—আণবিক গঠন সংক্রান্ত তার মৌলিক ও যুগান্তকারী তত্ত্ব উপস্থাপনার কাজে।

আর, চূড়ান্ত উর্বর ও উন্মেষশালী এ পর্যায়েই বোরের জীবনে অন্তঃসলিলা বেগে বয়ে যাচ্ছিল মারগ্রেথ নরল্যান্ড নাম্নী এক সুশিক্ষিতা সুন্দরী নারীর সংগে প্রণয়পর্ব—যা পরিণয়সূত্রে পরিণত হ'ল 1912 সালের পয়লা আগস্টে, যখন বোর ফিরে এসেছেন কোপেনহেগেনে। বড় কাজ—সৃজনশীল কাজ—ও বিয়ের সংগে সম্পর্ক যে সবসময়ই বিরোধাত্মক নয় তার আর একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল! এবং এই মারগ্রেথ সর্বার্থেই ছিলেন বোরের সার্থক সহধর্মিনী—তাঁর জীবনের শোকে-দুঃখে-সন্তাপে-আনন্দে-বেদনায়। কেননা, অ্যাকাডেমিক ও বৃহত্তর জীবনে নানা মনোমালিন্য ছাড়াও ব্যক্তিজীবনেও বোর যথেষ্ট আঘাত পেয়েছিলেন—

> "ঘটনাচক্রে বোর এলেন লস আলামসে। তাঁকে কাজ করতে হ'ল, অবস্থার চাপে, এমন একটি বিজ্ঞানী-দলের সঙ্গে যাঁরা তখন নিউক্লিয়ার এনার্জিকে যুদ্ধমুখী উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন। নিছক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ ও কৌতুহল থেকে তিনি তখনকার মত সে কাজে এগিয়ে গেলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর বিশ্ববীক্ষা ও বিবেকের কম্পাস তাঁকে ভবিষ্যতের মানুষদের এর বিপদ সম্পর্কে সজাগ করে দেবার দায়িত্বও কাঁধে চাপল ঠিক তখনই।"

1903 সালে গ্যামেলহোল্‌স গ্রামার স্কুল থেকে নীল্‌স্ বোর কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করেন। তারপর তাঁর প্রবেশ কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে 1909 সালে সসম্মানে মাস্টার ডিগ্রী পেলেন, আর 1911-তে অর্জন করলেন ডক্টরেট ডিগ্রী। গবেষণার বিষয় ছিল—"ধাতব পদার্থের ইলেকট্রন তত্ত্ব"। কিন্তু এই থিসিস লেখার সময়েই বোর তাঁর ব্যবহৃত চিন্তা ও তত্ত্বের অসামঞ্জস্য, অপ্রতুলতা ও অসামর্থ্য সম্পর্কে ছিলেন সম্যক অবহিত। নিজের গবেষণা নিবন্ধেও বোর তাঁর সে সংশয় গোপন রাখেন নি। বরং যে সব ঘটনাসমূহ গুণগত ভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করছিলেন বোর, তা ক্ল্যাসিক্যাল ইলেকট্রোডাইনামিক্‌স্ এর মূলসূত্রগুলো থেকে পরিমাণগত ভাবে যে নির্ণয় করা যায় না, সে সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট ভাষায় সমালোচনামূলক ভংগীতে তা সেখানে প্রকাশ করেন। তাই ডিগ্রী পেয়েই থেমে গেলেন না বোর। এমনিতেই দমে যাবার লোক ছিলেন না তিনি; তাঁর সাথে ছিল অতৃপ্তি ও সংশয়ের খোঁচা—যা তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল সামনের দিকে।

ডি. ফিল ডিগ্রীলাভের পরেই বোর প্রথমে ইংল্যান্ডে এলেন খ্যাতনামা পদার্থবিদ জে. জে. টমসনের কাছে। উদ্দেশ্য টমসনের সঙ্গে থেকে তাঁর তাঁদের দুটি সন্তানের অকালমৃত্যু ঘটেছিল তাঁর জীবদ্দশাতেই। বোর দম্পতির বাকি চার ছেলে সবাই উচ্চশিক্ষিত এবং পরবর্তীকালে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন—যাঁদের মধ্যে একজন হ'লেন অ্যায়েজ বোর (Aaage Bohr) যিনি পরে কোপেনহেগেনে নীলস্ বোর ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর পদেও বৃত হন। পারিবারিক জীবনে কিন্তু তিনি ছিলেন ঘোর সংসারী। পারলেই রোজ ডিনার টেবিলে এসে স্ত্রী, বন্ধুবান্ধব ও ছেলেদের সংগে ব'সে চুটিয়ে আড্ডা দিতেন এবং সুযোগ পেলেই সাংসারিক খুঁটিনাটি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন। পিতৃত্বের ভূমিকা পালনেও বোর ছিলেন যথেষ্ট মনোযোগী ও নিষ্ঠাবান।

1912-র হেমন্তে বোর কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। এ সময় থেকেই পদার্থবিদ্যায় গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা এক বিশেষ বাঁক নেয়। 1913 সালে বোর "ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিন"-এর পর পর তিনটি সংখ্যায় আণবিক বিকিরণ তত্ত্বের ওপর তিনটি অত্যন্ত মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন—বস্তুত, বোর তত্ত্ব হিসেবে স্নাতক স্তরে আমরা এদেশে যা পড়ে থাকি তা মূলত এই তিনটি প্রবন্ধেরই নির্যাস। 1914 থেকে 1925 সাল পর্যন্ত সময়ে তিনি

অণুতত্ত্ব ও বিকিরণতত্ত্বের সংযোগ স্থাপনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যান। 1916 সালে নীল্‌স্‌ বোর কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ অধ্যাপক পদে বৃত হন। 1921 সালে কোপনহেগেনে তিনি তত্ত্বীয় গবেষণার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন যা তাঁর নাম অনুসারে "নীল্‌স্‌ বোর ইনস্টিটিউট" নামে পরিচিত হয়। ইতিমধ্যেই তাঁর কোয়ান্টাম তত্ত্ব বিশ্বে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং এর পরীক্ষামূলক সত্যতাও অনেকটাই প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং এ কাজের স্বীকৃতিতেই 1922 সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। কিন্তু নোবেল পুরস্কার পাওয়া মানে যে সব-পেয়েছির মনোভাব নিয়ে আত্মতৃপ্ত হ'য়ে চুপচাপ ব'সে থাকবেন বোর, সে ধাতুতে তিনি গড়া নন। তার সুযোগও অবশ্য ছিল না—বাধা বাঘা দিকপালরা—যাঁদের মধ্যে একজন হ'লেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন স্বয়ং—কোয়ান্টাম তত্ত্বের নানা বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক প্রশ্ন নিয়ে সমালোচনার ঝড় তুললেন এবং 1925-1935 সাল হ'ল বোরের জীবনে এক যুগপৎ উপভোগ্য ও যন্ত্রনাদায়ক অধ্যায়—যে সময়ে তিনি তাঁর 'কম্‌প্লিমেন্টারিটি' সূত্রের সমর্থনে নিরলস সংগ্রাম করলেন—যাকে বলে সত্যিকারের মসীযুদ্ধ। কিন্তু বোর শেষ পর্যন্ত আইনস্টাইনকে তাঁর 'কম্‌প্লিমেন্টারিটি' সূত্র সম্পর্কে নিঃসংশয় করতে পারেননি—যা তাঁর মনোবেদনার কারণ হয়েছিল। এবং এ সম্পর্কে আব্রাহাম পেইজ এবং ভিক্টর ভেইসকফ দু'জনেই একই কথা বলেছেন—বলেছেন যে আইনস্টাইন-বোর মতপার্থক্যই ছিল বোরের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রেরণা এবং যন্ত্রণা দুইই। কিন্তু তীব্র মতাদর্শগত বিরোধ থাকলেও দুজনেরই দুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল অটুট—তা তাঁদের লেখাপত্র পাঠ করলেই স্পষ্ট হয়। খুব সম্ভবত খানিকটা এ হতাশা থেকেই, 1936 সাল থেকে 1943 পর্যন্ত বোর তাঁর উদ্যোগ কেন্দ্রীভূত করেছিলেন নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যার গবেষণায়। আর 1943 থেকে 1962 সাল তাঁর জীবনের নানা সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও জ্ঞানতত্ত্বীয় দার্শনিক কাজে ব্যস্ত থাকার সময়। জীবনের উপান্তে এসে বোর 'জীবন' সম্পর্কেই খুব জিজ্ঞাসু হ'য়ে ওঠেন এবং জীব-পদার্থবিদ্যায় মনোনিবেশ করেন। খুব সম্ভবত, এ ক্ষেত্রে তাঁর বাবার প্রভাবও তাঁর ওপর কাজ করেছে। তাঁর জীবনের শেষ কাজ তিনি প্রকাশ করেন "Light and Life Revisited" নামক একটি পুস্তকে। তাছাড়াও তিনি তাঁর চিন্তাধারা তিনটি ভিন্ন গ্রন্থে বিবৃত করেন যা হ'লঃ (1) The Theory of Spectra and Atomic Constitution (2) Atomic Theory and Description of Nature (3) The Unity of Knowledge। বোর এবং আইনস্টাইনের দীর্ঘ জীবনের একটা অদ্ভুত মিল হ'ল যে এঁদের দুজনেরই অনেক নামী দামী ছাত্রস্থানীয় লোকজন ছিলেন কিন্তু এঁরা দু'জনে কেউই কোন ছাত্রের ডক্টরেট ডিগ্রীর সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করেননি। সেই অর্থে এঁরা দুজনেই টিপিক্যাল অধ্যাপক ছিলেন না! কিন্তু সবসময়েই এঁরা সব্বাইকে সাহায্য করবার চেষ্টা ক'রে গিয়েছেন—সে ছাত্রই হোন, অধ্যাপকই হোন বা লেখাপড়ার জগতের বন্ধুই হোন। 1962 সালের 18ই নভেম্বর কোপেনহেগেনে সাতাত্তর বছর বয়সে নীল্‌স্‌ বোর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সামাজিক ভূমিকায় বোর

বিংশ শতাব্দীর তিরিশ ও চল্লিশে রদশকের ইউরোপ রাজনৈতিক দিক থেকে প্রবল ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত। তিরিশের দশকেই জার্মানীতে নেমে এসেছে নাৎসী সন্ত্রাস ও রাজত্ব। আশ্রয়প্রার্থী বহু বিজ্ঞানী নাৎসী বাহিনীর তাড়া খেয়ে চলে আসতে লাগলেন ডেনমার্কে, কোপেনহেগেনে—বোরের-স্থাপিত প্রতিষ্ঠান নীল্‌স্‌ বোর ইনস্টিটিউট হ'য়ে উঠল সেই সব পলাতক বিজ্ঞানীদের নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল। এরকম প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য ছাড়াও নীল্‌স্‌ বোর এগিয়ে এলেন তাঁদের জন্য আরো নানারকম কার্যকর সাহায্যে। ধীরে ধীরে ডেনমার্কেও নেমে এল নাৎসী আক্রমণ। বোর নাৎসী চক্রকে সাহায্য তো করলেনই না—উল্টে প্রতিরোধ বাহিনীর সংগে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করে চলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না। তাঁকেও শেষ পর্যন্ত সুইডেন হ'য়ে পালিয়ে যেতে হ'ল আমেরিকায়।

জীবনের চূড়ান্ত পর্যায়ে এ সময়ে আমেরিকায় থাকাকালীন ঘটনাচক্রে বোর এলেন লস আলামসে। তাঁকে কাজ করতে হ'ল, অবস্থার চাপে, এমন একটি বিজ্ঞানীদলের সঙ্গে যাঁরা তখন নিউক্লিয়ার এনার্জিকে যুদ্ধমুখী উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য কাজ ক'রে যাচ্ছিলেন। নিছক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ ও কৌতূহল থেকে তিনি তখনকার মত সে কাজে এগিয়ে গেলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর বিশ্ববীক্ষা ও বিবেকের কম্পাস তাঁকে ভবিষ্যতের মানুষদের এর বিপদ সম্পর্কে সজাগ ক'রে দেবার দায়িত্বও কাঁধে চাপাল ঠিক তখনই। 1944 সালের তেসরা জুলাই একটি স্মারকলিপি আকারে তিনি তাঁর সতর্কতামূলক বাণী লিপিবদ্ধ করলেন যার ভাষা হ'ল, "...আজ যে সাঙ্ঘাতিক ও মারাত্মক অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে তা রদ করতে আমাদের সকলের পক্ষে উদ্যোগ নেওয়া অত্যন্ত জরুরী হ'য়ে পড়েছে; এমন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যাতে জাতিতে জাতিতে আজ যে অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে তা সমূলে বিনষ্ট হয়, এবং এদের ভেতর সৌহার্দ্য ও সহযোগিতামূলক সম্পর্কের ওপরেই পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।" এ বয়ান তিনি তৈরী করেছিলেন রুজভেল্টের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্ববর্তী ধাপ হিসেবে এবং এই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল 1944 সালের 26 শে আগস্ট স্থায়ী হয়েছিল প্রায় দেড় ঘন্টাকাল। তার আগেই 1944 সালের 16ই মে ইংল্যাণ্ডে চার্চিলের সঙ্গে তাঁর স্বল্পমেয়াদী সাক্ষাৎকার ঘটে এবং দুজনের মতের মিল হয়না মোটেই।

1944-এর 18 ই সেপ্টেম্বর চার্চিল ও রুজভেল্টের মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটলো নিউ ইয়র্কে। তা থেকে তাঁরা যে তিনটি সিদ্ধান্ত নিলেন তা হ'লঃ (ক) আণবিক বোমা সংক্রান্ত সব কিছুই অত্যন্ত গোপনীয় হিসেবে বিবেচনা করা হবে, (খ) ইংল্যান্ড ও আমেরিকা আণবিক বোমা সংক্রান্ত কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। (গ) অধ্যাপক বোরের কাজ-

কর্মের ওপর দু'দলই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে যাতে তিনি আণবিক বোমা সংক্রান্ত কোন কথাবার্তা বা তথ্য ফাঁস না করে দিতে পারেন। ফলে সব ধাক্কা গিয়ে পড়লো অধ্যাপক বোরের ওপর। তাঁর গতিবিধির ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখা হল। তবু বোর চললেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভালোমানুষি ও বলিষ্ঠতা নিয়ে। কিন্তু মানসিক প্রশান্তি তিনি লাভ করেননি জীবনের শেষ অধ্যায়ে। অবশ্য বিবেকবান মানুষদের বেলায় এরকমই ঘটে থাকে। কখনো ইংল্যান্ডে, কখনো ডেনমার্কে, কখনো আমেরিকায় তাঁর জীবন কাটলো শেষ খণ্ডে। তার মধ্যেই ফাঁকে ফাঁকে তিনি নানা কাজ ও লেখাপড়া চালিয়ে গেলেন। 1950 সালের 12 ই জুন তিনি তাঁর স্মারকলিপি জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলের হাতে সমর্পণ করেন—যা আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের স্বপক্ষে এক জীবন্ত দলিল। আর 24 শে জুন কোরিয়ার যুদ্ধ শুরু হল, পয়লা নভেম্বর প্রশান্ত মহাসাগরে থার্মো-নিউক্লিয়ার বোমার বিস্ফোরণ ঘটালো আমেরিকা। যুদ্ধবাজ শক্তির হাতে শান্তি সেনার সে প্রকাশ্য পরাজয়ে বোর বিচলিত না হয়ে পারলেন না।

বিশ্বরাজনীতিতে কিছুকাল সক্রিয় ভূমিকা পালনের চেষ্টা ক'রে এবং অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে বোর আবার কোপেনহেগেনে ফিরে এলেন স্বস্থানে—নিজের তৈরি প্রতিষ্ঠানে। শেষ দিন পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন এ সংগঠনের সংগে। 1955 সালে ড্যানিশ সরকার বোরকে আণবিক শক্তির গঠনমূলক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে একটি কমিটিতে কাজ পরিচালনার দায়িত্ব দেন এবং বোর তা সুচারুভাবে পালন করেন। 1952 সালে যখন CERN তৈরির চেষ্টা শুরু হ'ল তখন তার তত্ত্বীয় গ্রুপটির আশ্রয়স্থল ও ঠিকানা ছিল নীল্‌স্ বোর ইনস্টিটিউটই। পরে 1957 সালে তা চলে যায় সুইজারল্যান্ডে। পরে অবশ্য কোপেনহেগেনে পাঁচটি 'নর্দিক' দেশ মিলে Nordic Institute for Theoretical Atomic Physics নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেন—যার উদ্দেশ্য ছিল এই পাঁচ-পাঁচটি দেশের তত্ত্বীয় পদার্থবিদদের কাজকর্মের সুযোগ ক'রে দেওয়া। এরও কার্য্যকর পরিচালনায় ছিলেন নীল্‌স্ বোর নিজে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বোর এরকম নানা সংগঠনের সংগে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন, সক্রিয় রেখেছেন নিজেকে অধ্যয়ন ও নানা সাংগঠনিক কাজে—যা সরাসরি সাজনৈতিক সংস্রব বহির্ভূত। তাঁর প্রকাশিত পুস্তকগুলোও বেশির ভাগই প্রকাশিত হয় তাঁর জীবনের এই শেষ অধ্যায়ে। মৃত্যুর এক বছর পরে প্রকাশিত হয় তাঁর শেষ লেখা "On Atomic Physics and Human Knowledge"—1963 সালে।

শেষের কথা

আজ তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা, বিশেষত তত্ত্বীয় কণা পদার্থবিদ্যা, একর ঘনীভূত সংকটের মধ্যে। জটিলতম গাণিতিক বর্গ (category)-গুলি সাহায্যে বাস্তব জগতের প্রতিরূপ (model) গঠনের বিরামহীন চেষ্টা অনেকটা যেন ক্লান্তিকর, উদ্দেশ্যহীন। ইংগিত পাওয়া যাবে Marc Kac-এর সুন্দর একটি উক্তি থেকে—"Models by their very nature have all sorts of artificial and unrealistic features built in and therefore caution is called for drawing physically valid conclusions from what after all are artfully contrived mathematical caricatures"। অনেক চোখ-ধাঁধানো আবিষ্কারের ছটায় আমাদের অনেকেরই দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে যাচ্ছে; দৃষ্টি সরে যাচ্ছে আসল সমস্যা থেকে আপাতসত্যের আড়ালে। তার সবটাই আলো না অনেকটাই আলেয়া সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার সুযোগ পাওয়া শক্ত। তবে উগ্র প্রসাধনের নীচে যে অন্তঃসারশূন্যতা দিনকে-দিন প্রশ্রয় পাচ্ছে এবং পদার্থবিদদের একটা বড় অংশই যে নিছক রুটি-রুজির স্বার্থে চিন্তার দাস্য প্রায় মুখ বুজে সয়ে যাচ্ছেন তার বিরুদ্ধে অল্প হ'লেও মিহি প্রতিবাদের সুর কখনও কখনও বিরল কণ্ঠে ধ্বনিত হয় বৈকি! যেমন, ফার্মি ন্যাশান্যাল ল্যাবরেটারির বিদগ্ধ অধ্যাপক জে. ডি. জোরকেন (J. D. Bjorken) বলেন "...I played a role of skeptic and conservative, one of the very last to jump on board the bandwagon"; ইটালীর বিশিষ্ট অধ্যাপক Preparata বলেন "The undeniable fact that this approach has been largely neglected by the physics community, I beleive, could form the object of a sociological study rather than of a scientific one!" আর কিছু নয়—এ মন্তব্যগুলো শুধুমাত্র সংকটের উৎকট লক্ষণ। এবং এ সংকটমুহূর্তেই আমরা টের পাই নীল্‌স্ বোর, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন প্রমুখের মত মানুষের ও বিজ্ঞানীর সামাজিক প্রয়োজনীয়তা—যাঁরা নতুন চিন্তার দিশারী, সত্য ও সততার কান্ডারী এবং সর্বোপরি মানবতাবোধের বটবৃক্ষ। □

তথ্যসূত্র নির্দেশ :

1. A. Pais : Niels Bohr Memorial Talk on 6 May 1985 at CERN, Preprint CERN 85-17 (13 November 1985) edited by M. Jacob.
2. V. F. Weisskopf : editorial, PHYSICS TODAY 38, no. 10, October 1985 pp. 191-92 (এবং ঐ সংখ্যার অন্যান্য নিবন্ধ)।
3. Nobel Lectures in Physics (1922-1941) : Published on behalf of the Nobel foundation, Elsevier Publishing Company, 1965.
4. L. Rosenfeld : Niels Bohr (Biographical sketch) "Niels Bohr Collected Works" vol. 1, p XVII (North Holland Publishing Company, 1972).
5. Niels Bohr : Atomic Physics and Human Knowledge, John Wiley and Sons Inc, New York, 1958.
6. Marc Kac : Statistical Physics, STATPHYS-13, Annals of the Israel Physical Society, vol 2 (I), p 113, edited by D. Cabib et al, 1978.
9. J. D. Bjorken : Preprint, Fermilab-Cnf-85/133 Sept 85, p 22.
8. G. Preparata : Preprint, CERN 83-04, 10 May 1983, p 525.

ক্যানসারের প্রতিকার ঃ কষ্টকল্পনা বনাম বিজ্ঞান

ভাস্কর মৈত্র
সুকুমার সাহা

ক্যানসারের নিশ্চিত প্রতিকার এখনো নাগালের অনেকটা বাইরে। তাই বলে ক্যানসার সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য কিছুই জানা নেই তা কিন্তু নয়। তথ্যের সমর্থন নেই এমন কোনো অনুমানের ভিত্তিতে ক্যানসারের সম্ভাব্য প্রতিকার নিয়ে কথাবার্তা বলার অর্থ—মানুষের বিভ্রান্তি এবং দুর্ভোগ বাড়ানো।

"ক্যানসার শব্দটা মৃত্যুর সমার্থক। ক্যানসার সারানো অ্যালোপ্যাথির কম্মো নয়। ক্যানসার সারানোর কোনো অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ নেই। তাই ক্যানসার সম্পর্কে অ্যালোপ্যাথরা কি বলে, তা শোনার আগ্রহ আমার আদৌ নেই। বরং যৌগিক, আয়ুর্বেদিক কিম্বা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরা ক্যানসার সারাতে পারে কি না, সে বিষয়ে খোঁজখবর রাখার চেষ্টা করি। অ্যালোপ্যাথের কাছে তো ক্যানসারের ওষুধ পাব না"—এরকম ধারণার বশবর্তী হয়ে একসময় সুদীপ্তর খোঁজখবর নেয়ার চেষ্টা "সফল" হয়েছিল। যৌগিক চিকিৎসাই যে ক্যানসারের সার্থক চিকিৎসা, তা সে বুঝতে পেরেছিল যৌগিক হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শিবানন্দ সরস্বতীর লেখা 'যোগবলে রোগ-আরোগ্য' বইয়ের একটি লাইন পড়ে— "করোনারী থ্রম্বসিস এবং ক্যানসার প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্যেও আমাদের এই সহজ যৌগিক প্রক্রিয়ার সুফল দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি।"

ক্যানসার রোগের নিরাশার সমুদ্রে সুদীপ্তর চোখে যৌগিক চিকিৎসাই আশার দ্বীপ হিসেবে দেখা দিয়েছিল। কোনো প্রদীপ্তর কাছে আশার দ্বীপটা হয়ত হোমিওপ্যাথি, অদীপ্তর কাছে হয়ত বা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা। সুদীপ্ত প্রদীপ্ত, বা অদীপ্তের দল কিন্তু একটা দিকে তাকায়ই নি। তাকালে সামনেই চোখে পড়ত, নিরাশার সাগরে আশার দ্বীপ নয়, দ্বীপপুঞ্জ ক্রমশ বিস্তারলাভ করছে। আজকের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাই (ভুল ক'রে যেটাকে এখনও অনেকে বলে "অ্যালোপ্যাথি") সে দ্বীপপুঞ্জের মাটি।

ক্যানসারের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার প্রতি দৃষ্টিপাত করার আগে আমরা আজকের বিজ্ঞানের নিরিখে ক্যানসারের কার্যকারণ সংক্রান্ত স্বামী শিবানন্দ সরস্বতীর ধারণার যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা করব। সংক্ষেপে স্বামী শিবানন্দ সরস্বতীর ধারণার মূলকথা এরকম ঃ

আয়ুর্বেদ মতে বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই ত্রিধাতুও রক্ত দূষিত হয়ে যে অর্বুদ সৃষ্টি হয়, তার আধুনিক নাম ক্যানসার। শরীরের "রক্ত অত্যধিক অম্লধর্মী" হয়ে দূষিত হ'লে দেহ ক্যানসার রোগ সৃষ্টির অনুকূল হয়ে ওঠে। দেহের দূষিত রক্তের বা রক্তের "অম্লবিষে"র মাঝে তখন "ক্যানসার রোগবীজাণু"র সৃষ্টি হয়। রোগবীজাণুগুলো সূত্রাকারে জমে দেহের যে কোনো জায়গায় আশ্রয় নেয়। রোগবীজাণু ধ্বংসকারী "শ্বেতরক্তাণুগুলির" হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা নিরাপদ দুর্গ তৈরির ব্যবস্থা করে। ক্যানসার রোগবীজাণুদের এই দুর্গই টিউমার হিসেবে প্রকাশ পায়। এরপর ঐ টিউমারস্থিত বিষের প্রভাবে ওখানে ঘা হয়।

ধূমপান ক্যানসার রোগের আনুষঙ্গিক কারণ। পথ্যদোষে যাদের "রক্ত স্বভাবতই অম্লধর্মী", তারা যদি ধূমপায়ী হয়, তাহলে রক্তের অম্লবিষের সাথে তামাকের নিকোটিন বিষ মিশে রক্তে আরো বেশি অম্লবিষ সঞ্চিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। ফলে সহজেই দেহে ক্যানসার রোগ বীজাণু সৃষ্টি হতে পারে।

পাইওরিয়া রোগ ক্যানসার রোগসৃষ্টির একটি "বিশেষ কারণ"।

শরীরের কোনো জায়গা কেটে গেলে ঐ কাটা জায়গার ক্ষত বা শরীরের কোথাও ঘর্ষণের ফলে তৈরি ক্ষত ক্যানসার ক্ষত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। মোট কথা, শরীরে ক্যানসার রোগ সৃষ্টির উপযোগী বিষ সৃষ্টি হ'লে তা যেভাবেই হোক, শরীরের যে কোনো জায়গা আক্রমণ ক'রে ক্ষত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেই।

বিজ্ঞানের নিরিখে

এক ।। "অত্যধিক অম্লধর্মী রক্ত" বনাম ক্যানসার

রক্ত কতটা অম্লধর্মী বা ক্ষারধর্মী, তা পি. এইচ. (pH) স্কেলে মাপা হয়। কোনো জলীয় দ্রবণের পি. এইচ. 7 বলতে বোঝায় তা প্রশম বা নিউট্রাল (neutral)। পি. এইচ. 7-এর যত কম হবে (0 অবধি), দ্রবণ তত অম্লধর্মী আর পি. এইচ 7-এর যত বেশি হবে (14 অবধি) দ্রবণ তত ক্ষারধর্মী বোঝায়।

আমাদের রক্তের পি. এইচ. 7.4। এর অর্থ রক্ত সামান্য ক্ষারধর্মী। সুস্থ শরীরে (Physiological condition) রক্তের পি. এইচ. 7·36 থেকে 7·44-এর মধ্যে ওঠানামা করে। রক্তের পি. এইচ. 7·36 এর কম কিম্বা 7.44 এর বেশি হওয়ার অর্থ শরীর অসুস্থ (Pathological condition)। কোনো মানুষের রক্তের পি. এইচ. 7-এ নেমে আসার অর্থ সে মরণাপন্ন—কোমা (coma)-য় আক্রান্ত। কোমা অবস্থায় কারো রক্তের পি. এইচ. বড়জোর 6.8 অবধি নামতে পারে।

ওপরের বিজ্ঞানসম্মত তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, মানুষের রক্ত অম্লধর্মী হওয়া তো দূরের কথা, প্রশম অবস্থায় আসা মানেই মানুষটির মৃত্যুর মুখোমুখি অবস্থা। রক্ত অত্যধিক অম্লধর্মী হয়ে দেহে ক্যানসার রোগসৃষ্টির অনুকূল অবস্থা গড়ে ওঠার আগেই কোমা

অবস্থায় মনুষ্যপ্রাণীর মৃত্যু ঘটবে। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবিটিজ (uncontrolled diabetes mellitus) রোগীর রক্তের পি. এইচ. 7·0-তে নেমে ক্যানসারে নয়, কোমায় মৃত্যু ঘটা তাই ঘটনা।

দুই ।। "ক্যানসার রোগবীজাণু" বনাম ক্যানসার

গবেষণাগারে জন্তুজানোয়ারের দেহে কয়েক ধরণের ক্যানসারের উৎপত্তির সাথে ভাইরাসের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। তবে **মানুষের শরীরে ক্যানসার সৃষ্টির কারণ হিসেবে ভাইরাসের দায়িত্বের কথা আজও প্রমাণিত হয়নি। তাছাড়া ক্যানসার জন্তু থেকে মানুষে সংক্রামিত হয় না।** যেহেতু মানুষের ক্যানসারে "ক্যানসার রোগবীজাণুর" অস্তিত্বই অপ্রমাণিত। অপ্রতিষ্ঠিত, সেহেতু টিউমারকে রোগবীজাণুদের দুর্গ মনে করার প্রশ্নই ওঠে না।

তিন ।। পাইওরিয়া রোগকে বিজ্ঞানীরা আজও ক্যানসারের কারণ হিসবে চিহ্নিত করেননি।

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, যোগ—এ সবই অভিজ্ঞতালব্ধ চিকিৎসা ব্যবস্থা (empirical medical system)। যেহেতু অভিজ্ঞতালব্ধ, সেহেতু এদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য কার্যকরী হাতিয়ার থাকা অসম্ভব নয়। সেগুলো গ্রহণ করার আগে বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডে যাচাই করা দরকার। ক্যানসারের চিকিৎসা হিসেবে যে যৌগিক, হোমিওপ্যাথিক বা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা প্রচলিত, তা বৈজ্ঞানিক মানদন্ডে আজও যাচাই করা হয়নি।

মনে রাখা দরকার, কেউ যদি যৌগিক, হোমিওপ্যাথিক বা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাধীন কোনো ক্যানসার রোগীর আরোগ্যলাভ করার দাবী করে এবং তার দাবীর সত্যতাও যদি প্রমাণিত হয়, তাহলেই কিন্তু এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, সেই চিকিৎসাপদ্ধতির ক্যানসার রোগ সারাবার ক্ষমতা আছে। কেননা, কোনো কোনো ক্যানসার আপনা থেকেই সেরে যাবার কিছু কিছু বিবরণ ক্যানসার গবেষকদের নথিভুক্ত হয়েছে। যেমন—

এক ।। একটি আড়াই মাসের শিশুর উরুতে সার্কোমা (একধরনের ক্যানসার) হয়ে তা ছড়িয়ে গেল উর্বাস্থিতেও। শিশুটি অচিকিৎসিত অবস্থায়ই থাকল। পাঁচ বছর পর দেখা গেল, শিশুটির সুন্দর স্বাস্থ্য। ক্যানসারের কোনো চিহ্নই নেই শরীরে।

দুই ।। ন'মাসের একটি শিশুর অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির নিউরোব্লাস্টোমা (এক ধরনের ক্যানসার) হয়েছিল। অপারেশন ক'রে খানিকটা অংশ বাদ দেয়া সম্ভব হয়েছিল। বাকি রয়েই গিয়েছিল। দেখা গিয়েছে, চব্বিশ বছর বয়েসেও সে পুরোপুরি সুস্থ ও কর্মক্ষম।

তিন ।। এক মহিলার জরায়ুর সার্কোমা ছড়িয়ে গিয়েছিল শ্রোণীর সর্বত্র। রেডিয়াম চিকিৎসায় ফল হোলো না। চিকিৎসা শেষ হবার আগে রোগিনীর শরীরে এলো নাটকীয় পরিবর্তন ঃ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে খুব জ্বর হোলো, রক্তে ইওসিনোফিলের সংখ্যা বেড়ে গেল আর আমবাত (চলতি কথায় 'চামড়ার অ্যালার্জি') বেরোল সারা গায়ে। কয়েক কিলোগ্রাম ওজনের টিউমার এরপর কমতে কমতে কিছুদিনের মধ্যেই মিলিয়ে গেল, পেটে জমা জলও দূর হোলো। এই ঘটনার দশ বছর পরেও মহিলাটির সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকার খবর পাওয়া গিয়েছে।

চার ।। ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমাও আপনা আপনি ভালো হয়ে যাওয়ার যথেষ্ট নজির আছে।

ক্যানসার সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা হোলো, ক্যানসার একটা মাত্র রোগ নয়—রোগের একটা পরিবার (cancer is not one disease, but a family of diseases)। শরীরের এক এক জায়গায় এক এক ধরনের ক্যানসার হয়। এক এক ধরনের ক্যানসার (যেমন স্তনের ক্যানসার) এক একটা রোগ। সব ক্যানসারের পরিণতি মৃত্যু নয়। কোনো কোনো ক্যানসার একেবারে শেষ অবস্থায় ধরা পড়ে, তাদের চিকিৎসা প্রায়ই সফল হয় না। কিন্তু বহু ক্যানসারই শুরুতেই ধরা যেতে পারে, প্রথম অবস্থাতেই বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা করলে একেবারে সেরে যায়। ফুসফুসের ক্যানসারে বাঁচার সম্ভাবনা 5%-10%, অথচ মেয়েদের জরায়ুমুখের (cervix) ক্যানসার প্রথম অবস্থায় ধরা পড়লে বাঁচার সম্ভাবনা 100%—অবশ্য যদি প্রথম থেকেই বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা করা হয়। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য "...শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি ক্যানসার রোগীকে পুরোপুরি সারানো সম্ভব যদি রোগ একেবারে প্রথম অবস্থায় ধরা পড়ে এবং খুব তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করা হয়।" আমাদের সমাজে শিক্ষার অভাবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগী বুঝেতই পারে না তার উপসর্গ ক্যানসারের প্রকাশ হতে পারে কিনা। রোগ বাড়লে যখন সে ডাক্তারের কাছে যায়, তখন অনেক দেরি হয়ে যায়।

ক্যানসার মধ্যবয়স পেরিয়ে যাওয়া লোকেদের বেশি হয়। তাই বিশেষ ক'রে বয়স্কদের ক্যানসার রোগের ব্যাপারে চেতনা বাড়াতে হবে। চেতনা বাড়ানোর অর্থ কিন্তু আতঙ্কিত হওয়া নয় বরং সতর্ক হওয়া। নিচের লক্ষণগুলোর কোনোটা প্রকাশ পাওয়ার অর্থই কিন্তু ক্যানসার হওয়া নাও হতে পারে। তবে এদের কোনোটা প্রকাশ পেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে ক্যানসার হয়নি জেনে নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার।

এক ।। স্তনের কোথাও কোনো দলা বা পিন্ড বা শক্ত এলাকা সৃষ্টি হয়েছে কিনা তা মেয়েদের প্রতি মাসে অন্তত একবার নিজে নিজে টিপে পরীক্ষা করতে হবে।

দুই ।। দেহের কোনো অংশে কোনো পিন্ড বা স্ফীতি দেখা দিয়েছে।

তিন ।। কোনো ঘা ভালো হচ্ছে না বরং দ্রুত বাড়ছে।

চার ।। দীর্ঘদিন ধ'রে যন্ত্রণাদায়ক কাশি বা স্বরভঙ্গ।

পাঁচ ।। কোনো বৃদ্ধের মাঝে মাঝে কোষ্ঠকাঠিন্য হচ্ছে, আবার মাঝে মাঝে আমাশার মতো হচ্ছে অথচ ওষুধ খেয়ে সারছে না। হজমের গন্ডগোল দীর্ঘদিন ধ'রে একই রকম থাকছে, সারছে না। বিশেষত ঐ বৃদ্ধের মলমূত্রের স্বাভাবিক অভ্যাসের কোনো পরিবর্তন ঘটেছে। বেশ কিছুদিন ধ'রে কোনো বৃদ্ধের খাবার গিলতে অসুবিধে হচ্ছে।

ছয় ।। মুখ, নাক, কান দিয়ে রক্তপাত, পায়খানা বা পেচ্ছাবের সাথে রক্তপাত, যার কোনো কারণ ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না।

সাত ।। 45/50 বছরের কোনো মহিলার (যাঁর স্থায়ীভাবে মাসিক বন্ধ হতে চলেছে) যোনিপথে অনিয়মিত, অস্বাভাবিক বা অত্যধিক রক্তপাত। কিম্বা কোনো বয়স্কা মহিলার যোনি দিয়ে মাঝে মাঝে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, যদিও তাঁর মাসিক স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে অনেকদিন আগেই।

আট ।। আঁচিল বা তিল কিম্বা জড়ুলে হঠাৎ কোনো পরিবর্তন—যেমন রক্তপাত, বা তা শক্ত হয়ে উঠেছে।

নয় ।। ওজন খুব ক'মে যাচ্ছে অথচ কেন কমছে বোঝা যাচ্ছে না।

আবারও বলছি, ওপরের লক্ষণের কোনোটা কারো শরীরে দেখা দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, তাঁর ক্যানসার হয়েছে, তবে এক্ষেত্রে দেরি না ক'রে ডাক্তার দেখিয়ে জানা দরকার কি হয়েছে। ক্যানসার হ'লে অবিলম্বে চিকিৎসা করাতে হবে—অবশ্যই বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা, বাঁচার আশার আলো ওতেই জোরালো কিনা। □

সাহায্যকারী বইপত্র

1. যোগবলে রোগ-আরোগ্য—স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী 17শ সংস্করণ, 1390 (বাং)
2. Text book of Medical Physiology ; 6th edition, 1981—A. C. Guyton
3. ক্যানসার, প্রথম সংস্করণ ; 1387 (বাং) —অমিয়কুমার হাটি
4. হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান (সংকলন, পঃ বঃ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা) 1984 ; আশিস ঠাকুরের বক্তব্য
5. রোগ ও তার প্রতিষেধ, 1981 সুখময় ভট্টাচার্য।

রিপোর্ট

ভূপাল ঃ রাষ্ট্রীয় অভিযান সমিতি

গত পাঁচই জানুয়ারী, 1986 ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার জন্য গঠিত রাষ্ট্রীয় অভিযান সমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হয় দিল্লীতে। ভারতের নানা জায়গা থেকে বিভিন্ন সংগঠন এতে অংশগ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গের 'আর ভূপাল নয়, কমিটির প্রতিনিধিও ছিলেন সেখানে। এই আলোচনা-সভায় জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের জন্য সমিতির এক কর্মসূচী ঠিক করা হয়।

8ই থেকে 14ই ফেব্রুয়ারী 'কার্বাইড বিরোধী সপ্তাহ' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। ঠিক হয় ইউনিয়ন কার্বাইডের সব হোর্ডিং এবং পোস্টারে কালো রং লেপে দেওয়া হবে। টেলিভিশন বা রেডিওতে ইউনিয়ন কার্বাইডের কোন বিজ্ঞাপন প্রচারিত হলে বিক্ষোভ দেখানো হবে। কার্বাইডের জিনিস বয়কট করার প্রয়োজন আছে, কারণ এটা আজ স্পষ্ট যে সরকার কার্বাইডের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে অনিচ্ছুক।

ভূপাল দুর্ঘটনা সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে প্রচার চালানোর সিদ্ধান্তও ঐ সভায় নেওয়া হয়। গত তেসরা জানুয়ারী সমিতির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি দাবীপত্র পেশ করা হয়। এই দাবীপত্রের সঙ্গে ছিল সারা দেশ থেকে সংগৃহীত এক লক্ষ মানুষের স্বাক্ষর। ভূপালের গ্যাস-দুর্গত মানুষের ত্রাণ পুনর্বাসন ও চিকিৎসা সম্পর্কিত অন্য একটি দাবীপত্র ভারতের শ্রমমন্ত্রী এন. ডি. তেওয়ারীর কাছে পেশ করা হয়। সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারপতির সভাপতিত্বে ভূপাল দুর্ঘটনার জন্য গঠিত তদন্ত কমিশন পুনরায় চালু করার দাবী জানানো হয়েছে। বলা হয়, ভূপালে কার্বাইডের গবেষণা কেন্দ্রে রাসায়নিক অস্ত্র তৈরীর প্রচেষ্টা চলছে কিনা সে ব্যাপারে তদন্ত হওয়া উচিত। স্থানীয় পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার প্রচেষ্টার চালানো উচিত।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় জাতীয় প্রচার সমিতির পক্ষ থেকে নিয়মিত পত্রিকা বার করা হবে। দিল্লীর 'সামন্ত সংগঠনে'র রবীন্দ্র শর্মা এ ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছেন।

'দাস্তান ই-গ্যাসকান্ড' এই পথনাটিকাটিকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ ও অভিনয় করা হবে।

মাদ্রাজের 'আর ভূপাল নয় কমিটি' ভূপাল দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণের মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি রিপোর্ট তৈরী করবে। প্রাসঙ্গিক তথ্য বা মতামত নীচের ঠিকানায় পাঠান যেতে পারে ঃ 'আর ভূপাল নয় কমিটি' (মাদ্রাজ), c/o. অর্জুন রাজাগোপালন, ফ্লাট-5, ব্লক-II, SBI অফিসারস্ কোয়াটার্স, 14 কলেজ লেন, মাদ্রাজ-600006.

বিভিন্ন সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, ডাক্তার, আইনজীবী, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের ভূপাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা চালানো হবে।

ভূপাল দুর্ঘটনার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশনের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় প্রচার সমিতির সদস্য সংগঠনগুলি সহযোগিতা করবে।

বিকল্প বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি প্রণয়নের ব্যাপারে একটি প্রস্তুতি-মূলক ওয়ার্কশপও অনুষ্ঠিত হয় 4ঠা জানুয়ারী 1986 তারিখে। এ ব্যাপারে একটি জাতীয় সেমিনার করার কথা ভাবা হচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় অভিযান সমিতির পরবর্তী সভা 8ই ও 9ই মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। □

সুদীপ্ত রায় বর্মণ

কার স্বার্থে বেবিফুড

স্মরজিৎ জানা

বেবী ফুড নামক জিনিসটি বুকের দুধের কোনো বিকল্পই নয়ঃ বহু দেশই আজ এ সত্যকে স্বীকার করছে নানান কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে। এদেশে কিন্তু ছবিটা একদমই আশাব্যঞ্জক নয়।

গলদঘর্ম অনিমেষ ধপ্ করে কৌটটা রাখল মেঝের উপর। মাসের শেষ সপ্তাহে বেশ কিছু টাকা ধার করে তবেই কিনতে পেরেছে দুধের কৌটটা। তবু মুখে তার তৃপ্তির হাসি। মনে রঙীন ছবি,—লেবেলের গোলগাল হাসিমুখো বাচ্চাটার মতন তরতরিয়ে বেড়ে উঠবে তার তিন মাসের বাচ্চাটা। তারপর সে স্কুলে যাবে, আরো বড় হবে, একদিন ডাক্তার হবে সে.... তারপর চেয়ারে বসে ঘস্‌ঘস্ করে লিখে দেবে কোন বাচ্চার জন্য বাজারের কোন দুধ কিনতে হবে, কোনটা সবার সেরা দুধ...

কত শতাংশ ডাক্তার জেনে কিংবা না জেনে বাচ্চা জন্মানো মাত্র একটা বেবীফুডের প্রেসক্রিপশন্ করেন তার সঠিক হিসেব এই মুহূর্তে দেওয়া না গেলেও সেটা যে খুব কম নয়—বিশেষত আমাদের দেশে—তা বোধহয় নিশ্চিতভাবেই বলা চলে। অবশ্য এ দেশে বেবীফুড কিনতে প্রেসক্রিপশন লাগে না। যে কোন দোকানে পয়সা দিলেই তা পাওয়া যায়। আর তাই বেবীফুড খাওয়ানোর হিড়িক শুধু শহরের উচ্চবিত্তের ঘরেই আটকে নেই—দূর গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষেরাও আজ একটিন বেবীফুড কেনার জন্য বোধহয় ঘটি বাটি বিক্রি করতে পেছপা নয়—প্রচারের দৌলতে বেবী-ফুডের মাহাত্ম্য এতদূর পৌঁছে গেছে। অথচ এইসব টিনের দুধ বুকের দুধের বিকল্প ত নয়ই এমনকি বুকের দুধের পরিপূরক খাদ্য হিসেবেও বেবীফুড কেনার কথা আদৌ বলা যায় কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ প্রচুর। বুকের দুধের সঙ্গে টিনের দুধের তফাৎগুলোয় এক এক করে আসা যাক। দুধে প্রোটিন, শর্করাজাতীয় পদার্থ ও ফ্যাট বা চর্বি জাতীয় পদার্থ ছাড়াও রয়েছে কিছু মিনারেল বা খনিজ, যাদের একসঙ্গে বলে 'অ্যাশ'। এগুলো যে অনুপাতে বুকের দুধে থাকে (যা বাচ্চার পক্ষে সবথেকে উপযুক্ত) সেই অনুপাতে কিন্তু টিনের দুধে থাকে না। মায়ের দুধে থাকে 'ল্যাক্টোফেরিন'—যা বাচ্চার প্রয়োজনীয় আয়রন যোগান দেয়—অথচ পেটের গোলমাল বা পেটের অন্য জীবাণুদের বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করে না। শেষের এই সম্ভাবনাটা কিন্তু বেবীফুডে থেকেই যায়। এছাড়া বুকের দুধে রয়েছে 'অ্যান্টিবডি' যা বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। এই 'অ্যান্টিবডি' কিন্তু হাজার মাথা খুঁড়লেও টিনের দুধে মিলবে না। বিশেষত প্রথম কদিন বুকের দুধে এ জিনিস থাকে প্রচুর পরিমাণে। এসব কথা ভেবে সুইডেনে প্রথম পাঁচদিন বাচ্চাকে শুধুমাত্র বুকের দুধ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাছাড়া বুকের দুধের প্রোটিনের সহজপাচ্যতা ঠিক একই রকম মাত্রায় টিনের দুধের ক্ষেত্রে রয়েছে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এছাড়াও বুকের দুধে রয়েছে 'বাইফিডাস ফ্যাক্টর' যা বাচ্চার অন্ত্রে (Intestine) এক ধরনের উপকারী জীবাণুদের বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এগুলো বাইরের শত্রুজীবাণুদের প্রতিরোধ করে। এই 'ফ্যাক্টরটি' কস্মিনকালেও টিনের দুধে মিলবে না।

এতো গেল খাদ্যগুণের কথা—এটাই কিন্তু সব নয়। বুকের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে মা ও সন্তানের মধ্যে এক বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর ভেতর শিশু প্রয়োজনীয় সাহচর্য ও নির্ভরতা খুঁজে পায় যা পরবর্তীকালে তার মানসিক গঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ বনিয়াদ হিসেবে কাজ করে। কেউ কেউ আজ বলছেন শিশুর চোয়ালের গঠনে বুকের দুধ টেনে খাওয়ার প্রক্রিয়াটি সাহায্য করে। এক কথায় বুকের দুধের সঙ্গে টিনের দুধের কোন তুলনাই চলতে পারে না। বুকের দুধের উৎকর্ষের ব্যাপারে কোন মহলেই কোন বিতর্ক নেই। এটি একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হোল বৈজ্ঞানিক মহলে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও সাধারণের মনের ধোঁয়াশার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। উপরন্তু বেবীফুড খাওয়ানোর প্রকোপ বেড়েই চলেছে—বিশেষত ষাটের দশকে য়ুরোপে এবং কিছু পরে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোতে মূলতঃ প্রস্তুতকারকদের কৌশলী প্রচার মাধ্যমগুলি এ কাজে সবথেকে বেশী সাহায্য করেছে। বিজ্ঞাপনের কুহকে ভুলে প্রথম উচ্চবিত্তের মায়েরা পরে নিম্নবিত্তের গ্রাম শহরের মায়েরা আজ কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে বেবীফুড কিনছেন। তাই বাধ্য হয়েই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাকে (W.H.O) কোম্পানীগুলোর ভয়াবহ অপপ্রচার রুখতে কিছু নীতি প্রণয়ন করতে হয়েছে। যেমন টিনের উপর তাদের লিখতে হবে বুকের দুধের শ্রেষ্ঠতার কথা, কোন বাচ্চার ছবি টিনের উপর লেবেল হিসেবে দেওয়া চলবে না। কোন মাকে বা তার পরিবারের কাউকে কোম্পানীগুলো সরাসরি কোন প্রচারপত্র দিতে পারবে না। পারবে না মায়েদের কোন ফ্রি স্যাম্পেল দিতে, পারবে না কোন অহেতুক ছাড় (discount), কোন কুপন বা কোন ধরনের উপহার দিতে। কারণ এগুলো দিয়েই তারা মায়েদের প্রলোভিত করে। আর তাদের রমরমা ব্যবসা ফাঁপিয়ে চলে দিনের পর দিন। আমাদের দেশে এই কোম্পানীগুলো কিন্তু এসব নিয়মনীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ফলাও ব্যবসা চালাচ্ছে। শুধু বিগত বছরেই এদের বিক্রির পরিমাণ বেড়েছে 40% (টাকার হিসেবে)। খাদ্যদ্রব্যগুলির ব্যবসার মধ্যে বেবী-ফুডের ব্যবসায়েই বৃদ্ধির হার সর্বাপেক্ষা বেশী।

শুধুমাত্র বুকের দুধের উৎকর্ষের জন্যই বেবীফুডের বাড়বাড়ন্তকে রোধ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ভাবলে কিন্তু বিরাট একটা ফাঁক থেকে যাবে। টিনের দুধ খাওয়ানোর ভিতর যে বাড়তি বিপজ্জনক সম্ভাবনা-গুলো রয়েছে সেটাই কিন্তু অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এরই ফলে প্রায় সমস্ত দেশের রাষ্ট্রনায়কদের চিন্তার কারণ হয়েছে সাধারণের 'বেবীফুড খাওয়ানোর' এই ক্রমবর্দ্ধমান অভ্যাসকে নিয়ে—বিশেষতঃ আমাদের মত দেশে যেখানে শিশুমৃত্যুর হার ভয়ানক রকম বেশী। হাজারে 120)। আর এই শিশুমৃত্যুর অন্যতম কারণ হোল পেটের রোগ (diarhoeal diseases)। অপুষ্টি সাহায্য করে পেটের রোগ বাড়াতে—পেটের রোগ সৃষ্টি করে আরো অপুষ্টি। এভাবে একে অপরের হাত ধরাধরি করে চলে। আর এ দুটো ব্যাপারকে খুব সুন্দরভাবে সাহায্য করে টিনের দুধ। এক, এই দুধ সম্বন্ধে সাধারণের এক বিরাট ধারণা (ভয়ানক পুষ্টিকর) এবং দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক কারণে তাঁরা খুব অল্প পরিমাণ দুধের গুঁড়ো প্রচুর পরিমাণ জলের সঙ্গে গুলে খাওয়ান, ফলে পুষ্টির ঘাটতি ঘটে। আর আমাদের মত দেশে যেখানে পরিষ্কার পানীয় জলের অভাব প্রায় সর্বত্র আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ও সাধারণ স্বাস্থ্যবিধিগুলোর সম্বন্ধে ধারণা তথা অভ্যেস যখন সাধারণের নেই বললেই চলে তখন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এর ক্ষতিকারক প্রভাবটা টিনের দুধ খাওয়ানোর সময় হাতে নাতে ধরা পড়ে। এই বেবীফুড খাওয়ানোটা কতখানি বিপজ্জনক হয়ে পড়ে তা বোম্বের নায়ার হাসপাতালের ছোট্ট একটা সমীক্ষায় বোঝা যায়। সেখানে দু'শ জন বাচ্চাকে সমীক্ষা করে দেখা যায় তাদের শতকরা 56 জনকে খাওয়ানো হচ্ছে বেবীফুড। যেসব মায়েরা বুকের দুধের বদলে বেবীফুড খাওয়াচ্ছেন তাদের শতকরা 83 জনই বাচ্চাদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম দুধ বেশী জল মিশিয়ে খাওয়াচ্ছেন, আর শতকরা 94 জন বোতল বা নিপ্‌লে কোনটাকেই পরিষ্কার বা জীবাণুমুক্ত করার কোন ব্যাপারেই যান্‌নি। আর এই বেবীফুডপ্রিয় মায়েদের শতকরা 80 জনই এসেছেন এমন পরিবার থেকে যাদের মাসিক আয় 150 টাকা বা তারও কম। এই 200 জন বাচ্চার মধ্যে মারা গিয়েছিল মোট 13 জন। এরা সবাই বেবীফুড খেত বুকের দুধের বদলে।

শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে আমাদের মত পেছিয়ে পড়া দেশেরাই শুধু নয় য়ুরোপের এগিয়ে থাকা দেশগুলোও আজ বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে বেবীফুডের প্রচারকে সীমিত করছেন, বাচ্চাদের বুকের দুধ খাওয়ানোকে উৎসাহিত করছেন। নরওয়ে বেবীফুডের প্রচারপত্র নিষিদ্ধ করেছেন। আলজেরিয়া, মোজাম্বিক, তানজানিয়া খোলা বাজারে বেবীফুড বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছেন। এখন শুধুমাত্র হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকেই তা পাওয়া যাবে। য়ুরোপের দেশগুলো WHO-র নিয়মনীতি প্রয়োগ করছেন কঠোরভাবে নিজেদের দেশে। শ্রীলঙ্কাতে বেবীফুডের উপর সমস্ত ধরনের প্রচার আজ আইন মোতাবেক বন্ধ। যদিও আমাদের দেশ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সনদনামায় স্বাক্ষরকারী তবু দেশের মাটিতে তা প্রয়োগে এখনো গড়িমসি চলেছে। 1980 সালে সরকার এক উচ্চপর্যায়ের কমিটি নিয়োগ করেন, যে কমিটিতে স্বাস্থ্যদপ্তরের লোক ছাড়াও, WHO, UNICEF এবং বেবীফুড প্রস্তুতকারকদের প্রতিনিধিরাও ছিলেন।—দীর্ঘ 14 মাস পরে তারা রিপোর্ট পেশ করেন। WHO প্রণীত নীতিগুলোর ফাকফোঁকর বন্ধ করে আরো কড়া কিছু আইন প্রনয়ণের পরামর্শ রয়েছে সেখানে। অবশ্য কোর্টে এগুলো টিঁকবে না বলে সরকারী পক্ষে অনেকে বলছে। আসলে বেতার এবং দূরদর্শনে কোম্পানীরা বিজ্ঞাপন দিতে আর উৎসাহী হবেন না, ফলে রাজকোষে অর্থের যোগান কমে যাবে, এই অজুহাতে কমিটির বক্তব্য নাকচ করে দেওয়া হয়েছে।

তাই বেবীফুড প্রস্তুতকারকদের এখন পোয়াবারো। নেসলে (Nestle) কোম্পানী তাঁদের শিক্ষিতা বিক্রেতাদের পাঠাচ্ছেন—হাসপাতালে। তাঁরা মায়েদের জ্ঞান দেবার ছলে প্রচার করছেন বেবীফুডের মহিমা। গ্লাক্সো (Glaxo) আরও একধাপ এগিয়ে—তারা ডাক্তারদের জন্য বাজারে ছাড়ছেন সস্তায় বিশেষ 'শেয়ার' যা কিনে তারা মালিকানার স্বত্ব পাবেন—আর তখন নিজের তাগিদেই বেবীফুড লিখবেন কথায় কথায়। প্রচারের দরকার হবে না। তাই মনে হয় এদেশে জনসাধারণকেই এগিয়ে আসতে হবে কোম্পনীগুলোর ভাঁওতাবাজী রুখতে। কোম্পানীগুলোর অপপ্রচার বন্ধ করতে প্রয়োজনে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। শুধু প্রচারের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নই নয়, একই রকম দরকার বাচ্চাদের বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য মায়েদের প্রয়োজনীয় পরিবেশ, অর্থাৎ অফিস বা কারখানার পাশাপাশি ক্রেশ (বাচ্চাদের রাখার জায়গা)-এর ব্যবস্থা; বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য দিনে অন্তত 1 ঘণ্টার বিশেষ ছুটি (break)। বুকের দুধ খাওয়া বাচ্চারা অসুস্থ হলে মায়েদের বিশেষ ছুটির ব্যবস্থা করা দরকার। লেসোথো সরকার ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থা-গুলো নিয়েছেন। অনেক দেশই আজ প্রয়োগ করতে চলেছেন উপরোক্ত বিধিগুলো। ফলে বিশ্বের এগিয়ে থাকা দেশগুলোর চিত্র পাল্টাতে শুরু করেছে—য়ুরোপের প্রায় সমস্ত দেশেই উচ্চবিত্তের মায়েরা আবার বাচ্চাদের বুকের দুধ খাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সুইডেনের মত দু-একটি দেশে পুরো ছবিটাই পাল্টে গেছে।—গ্রাম, শহরের সবশ্রেণীর মায়েরাই এখন বুকের দুধ খাওয়ানোর দিকে ঝুঁকেছেন। পাপুয়া নিউগিনিতেও চিত্রটা একইরকম। অথচ আমাদের মত পেছিয়ে থাকা দেশে—'বেবীফুডের নেশা' উত্তরোত্তর বাড়ছে—ব্যাপারটা খুবই বিপজ্জনক। সমীক্ষায় দেখা গেছে মায়েরা তাদের বাচ্চাদের এক বছর ধরে বুকের দুধ খাওয়াতে পারেন। মায়ের অপুষ্টি (খুব বেশী না হলে) বড় একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। দুধের পরিমাণ কিছু কমলেও প্রথম ছমাস বাচ্চার প্রয়োজনীয় দুধে ঘাটতি ঘটে না। এ তথ্য আমাদের দেশের মায়েদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ছমাস পর পাশাপাশি শক্ত খাওয়ার দেওয়ার প্রয়োজন সবসময়ই থাকে। কিন্তু তার আগে পাশাপাশি টিনের দুধ দিতে গেলে বুকের দুধের পরিমাণ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বহুক্ষেত্রেই বুকের দুধ না হওয়ার কারণ—বাচ্চাকে দুধ না খাওয়ানো। বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর ভেতরই বুকে দুধ জমা হওয়া নির্ভর করে। একে বলে 'Let-down reflex'। বহুজনাই এই সহজ ব্যাপারটা এড়িয়ে যান। তাই বুকে দুধ না হওয়ার ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। অবশ্য সত্যিই যদি বুকে দুধ না থাকে তবে বাচ্চাকে টিনের দুধ বা গরুর দুধ কিছু পরিবর্তিত করে বুকের দুধের কাছাকাছি করে নিয়ে খাওয়ানো যায়। মনে রাখবেন একটা তিনমাসের বাচ্চাকে যদি কখনো বাধ্য হয়ে বেবীফুড খাওয়াতে হয়—তবে একটা 500 গ্রামের কৌটোয় তার চলবে চার থেকে সাড়ে চার দিন। সেখানে খরচের কথাটা মাথায় রেখে গরুর দুধের কথা চিন্তা করাটাই যুক্তিযুক্ত নয় কি? □

সূত্র ঃ

W.H.O Cronicle—vol. 35, No. 4
India Today—March 12,, 83.

প্রশিক্ষণ চলে। কাজেই স্কুলগুলিতে গিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি বা অবস্থা সরেজমিনে দেখার সুযোগ আমাদের হয় নি। মধুর অভাবে গুড়ের মত শিক্ষার্থী-শিক্ষক ও 'একলব্যে'র অন্যান্য কর্মীদের সাথে কথাবার্ত্তা বলে অভাবটা পূরণের চেষ্টা করেছি। শোনা কথার ভিত্তিতে এ সম্পর্কে যে একটা আনুমানিক ধারনা হয়েছে বারান্তরে সে সম্পর্কে জানান'র ইচ্ছে রইল। কিন্তু পাঠ আদান-প্রদানের এই বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপিত নমুনা'র দিকে একটু মনযোগ দিয়ে তাকালে আমার মত আনাড়ী ব্যক্তির চোখেও অনুসৃত পদ্ধতি'র কয়েকটা **বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনা** চোখে না পড়ে পারে না। সেই 'শব ব্যবচ্ছেদ' পরের বারের জন্য তোলা থাক্।

জ্ঞান বিচিত্রা

একটি দুঃসাহসিক অভিযানে আপনার সহযাত্রিত্ব কামনা করছে

10 জগন্নাথ বাড়ি রোড,
আগরতলা 799 001, পশ্চিম ত্রিপুরা

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার স্বার্থে এবং একটি সাহসী ও সুন্দর প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তোলার জন্য আমরা একটি নিজস্ব মুদ্রণালয় স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছি। এই কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই টাকাটা আমরা 'জ্ঞান বিচিত্রা'র দু'হাজার নতুন গ্রাহক সংগ্রহ করে তুলতে চাই। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ভারতের অন্যত্র মিলিয়ে যে অগনিত অনুরাগী ছড়িয়ে আছেন এ ব্যাপারে তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করে তিনটি প্রস্তাব নিবেদিত হল :

☐ এক ।। যাঁর যতটুকু সামর্থ্য এককালীন সাহায্য হিসেবে দান করুন।

☐ দুই ।। যিনি যতটুকু পারেন তা ঋণ হিসেবে দিন—যা কিস্তিতে শোধ করে দেওয়া হবে।

☐ তিন ।। এক কালীন একশ টাকা দিয়ে তিন বছরের অথবা ছ'ত্রিশ টাকা দিয়ে এক বছরের গ্রাহক হয়ে পত্রিকার উন্নয়নে সাহায্য করুন।

1956 সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের 4 নং ধারা অনুযায়ী ফরম IV বিজ্ঞপ্তি

পত্রিকার নাম—বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রকাশনার ভাষা—বাংলা ও ইংরেজী
প্রকাশনার স্থান—52/9C বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা 700012
প্রকাশকাল—দ্বিমাসিক
প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—রবীন মজুমদার, ভারতীয়, কেমিক্যাল টেকনোলজি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 92, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি—700009.
মুদ্রকের নাম ও ঠিকানা—ঐ
সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—ঐ
প্রেসের নাম ও ঠিকানা—ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে লক্ষ্মী প্রেস, 15/সি পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-700009

আমি, শ্রী রবীন মজুমদার, ঘোষণা করিতেছি যে উপরিউক্ত বিবৃতি আমার জ্ঞান ও বিবরণ মতে সত্য।

প্রকাশক (স্বাঃ) রবীন মজুমদার
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গ
বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা

সদস্যদের কাছে আবেদন

অনেকেরই চাঁদা বাকি পড়ে আছে। অনুগ্রহ করে চাঁদা পাঠান। ডাকযোগে অথবা কারো মারফৎ। বর্তমানে সদস্য চাঁদা পনের টাকা।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা। পাঠানোর ঠিকানা —বি-ও-বি, অভিজিৎ লাহিড়ী, EC 106 সল্ট লেক, কলি-64

"বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী"

বাংলাদেশের পাঠকরা পত্রিকার জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

মাসিক
গণস্বাস্থ্য
পো : নয়ারহাট, ভায়া ধামরাই
ঢাকা, বাংলাদেশ

সমালোচনা

নাটক

এসিড বৃষ্টির পরে

মঞ্চের পর্দা জুড়ে আলো-আঁধারে মেঘের খেলা। দ্রুত লয়ে পাশ্চাত্য বাজনা, পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ নয়, এসিড বৃষ্টির এক ভয়াবহ আঙ্গিক রূপ তুলে ধরেছিল সেণ্টার ফর কালচারাল কমিউনিকেশন -এর 'এক্কা' পরিচালিত পরিবেশ সংক্রান্ত নাটক 'এসিড বৃষ্টির পরে'। বিষয় নির্বাচনে নাটকটি অভিনবত্ব দাবী করলেও নাটক যতই এগিয়ে চলে ততই মনে হয় বিষয় নির্বাচনে সমকালীন হওয়া ছাড়াও বোধহয় নাট্যগোষ্ঠী ও পরিচালকদের এই ধরনের নাটক প্রযোজনায় আরো বেশী দায়িত্ব থেকে যায়।

কিছুদিন আগে পশ্চিম জার্মানীর ব্ল্যাক ফরেস্টে যে বৃষ্টি হয়েছিল তাতে শুধু জল ছিলনা, ছিল এসিড। পরিবেশের যথেচ্ছ দূষণের ফলে এসিড বৃষ্টির সম্ভাবনা এখন প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পটভূমিকাতেই নাটকটির অবতারণা। এসিড বৃষ্টিতে আক্রান্ত বিকলাঙ্গ পঙ্গু নির্বোধ মানুষেরা বিরাট স্টেজ জুড়ে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুকরণে গাওয়া কিছু গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের 'না-মানুষ' হওয়ার প্রক্রিয়াকে বোঝানোর চেষ্টা, মুখোসধারী সমাজ-টমাজ-নিয়ন্ত্রক নেতা দ্বারা এই হাবাগোবা মানুষদের যথেচ্ছ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা, আর এদের মাঝে সতেজ নারীর আর্বিভাব এবং তার প্রতি ঐ নেতার লোলুপতা প্রদর্শন, কোন এক অজানা কারণে এই নারী কর্তৃক প্রকৃতির পুনর্বাসন ঘটিয়ে মুখোসধারীকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং না-মানুষদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করা— এই নিয়ে গান অভিনয়ের মাধ্যমে নাটকের উপস্থাপনা।

মাধ্যমের দুর্বল প্রয়োগ সর্বত্রই প্রকট। গানের সোচ্চার ভঙ্গী পরিবেশের গুরুত্ব অনেক লঘু করে দিয়েছে। গান রচনার ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে চিন্তার শৈথিল্য। শুনতে শুনতে অনেক সময়ই মনে হয় সস্তা হিন্দী চলচ্চিত্রের গান যেন কানের পর্দায় আঘাত করছে। না-মানুষদের নাচের ভঙ্গীতে সর্বত্রই ছিল শৃঙ্খলার অভাব।

দূষণ— ক্ষমতা বিদ্রোহ রাজনৈতিক চেতনার এই তিন মাত্রায় নাটকটিকে উপস্থাপিত করার চেষ্টা হলেও এই ত্রি-মাত্রিক সম্পর্কের জটিলতাকে কখনই স্পষ্ট করে তোলা যায়নি। সব মিলিয়ে নাটকটিতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে সেই তুলনায় অনুশীলন আর যত্নের চিহ্ন চোখে পড়েনি।

এই নাটক যেহেতু শুধু মনোরঞ্জনের জন্য নয়, মামুলী একটি সমাজ সচেতন নাটকও যেহেতু নয়, এই নাটক যেহেতু নতুন ভাবনার আন্দোলনের একটি নাটক সেইজন্য আমাদের প্রত্যাশার মাত্রাও অনেক বেশী। সে প্রত্যাশা এ নাটক পূরণ করতে পারেনি। আশংকা হয় নাটক দেখার পরে আমার মত অনেকেই না-মানুষদের মত হতবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে যাবে না তো?

পার্থ সেন □

রিপোর্ট

ভূপালে দশজন 'হ্যাম'

ভূপালের সেই কালোরাত্রির বিভীষিকা কিছুটা কমার পর অনেকেই গেছেন প্রতিবাদ, অনুসন্ধান, ত্রাণ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে। কিন্তু ঠিক দুর্ঘটনার মাঝে প্রাণ হাতের মুঠোয় করে অতি প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখতে যাবে কে? হ্যাঁ, গিয়েছিলেন—গিয়েছিলেন ভারতের কয়েকটি রাজ্য থেকে দশজন HAM অর্থাৎ অপেশাদার রেডিও অপারেটর বা Amateur Radio Operator, সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজস্ব / ব্যক্তিগত হাইফ্রিকোয়েন্সি (HF) বা ভেরী-হাই-ফ্রিকোয়েন্সি (V.H.F) ট্রান্সমিটার / রিসিভার (ট্রান্সরিসিভার) যাকে সোজা বাংলায় বলা হয় বেতার গ্রাহক / প্রেরক যন্ত্র। তাঁরা ভূপালে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ রক্ষায় অসামরিক ও জনসাধারণকে বেতার মারফৎ সাহায্য করেছেন। জনসাধারণ ও জেলা প্রশাসন HAM-দের নিঃশব্দ, সাহসিক কিন্তু দক্ষ কাজে বহুলভাবে উপকৃত হয়েছেন। ভূপালে HAM-রা মোট আটটি কেন্দ্র স্থাপন করেন, যেমন জয়প্রকাশ হাসপাতাল, হামিদিয়া হাসপাতাল, কাইসাল বাংলো, UNION CARBIDE-এর কন্ট্রোল রুম এবং শক্তি নগরে একটি করে এবং এছাড়াও পথে পথে ভ্রাম্যমান অবস্থায় ছিল V.H.F সেটগুলি, ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ ও অবস্থা, হাসপাতাল ও প্রশাশনকে জানাবার জন্য।

HAM-দের মূল উদ্দেশ্য হলো হঠাৎ কোন প্রাকৃতিক বা অন্য কোন দুর্ঘটনায় যখন সাধারণ মানুষ পুলিশ বা প্রশাসনের কাছ অবধি পৌঁছতে পারেনা বা পৌঁছলেও বিশেষ কোন ফল হয় না, তখন স্থানীয় একজন HAM-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁরা বিশ্বের যে কোন জায়গায় খবর পেতে পারেন বা দিতে পারেন, এর জন্য কোন মূল্য দিতে হয় না। এই HAM ছড়িয়ে আছে পৃথিবী জুড়ে। বোম্বাই থেকে আসা 21 বছর বয়সী ছাত্ররাও এমনই একজন HAM যে অধ্যাপকের বক্তৃতা ছেড়ে এই উদ্ধার কাজে 'HAM-SPIRIT'-এ ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ভূপালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেমন, পাকিস্থান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া ইউরোপ থেকে প্রতিনিয়ত অজস্র ব্যগ্র, আশঙ্কিত প্রশ্ন এসেছে— খোঁজখবর নিয়ে ভূপালের HAM STATION থেকে তার যথাযথ উত্তর দেওয়া হয়েছে। শক্তি নগরের মূল কেন্দ্রটি শহরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পরও দুই মাস কাজ চালিয়ে গিয়েছিল।

এই HAM-রা মরভী, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রের বন্যার সময়ও সক্রিয় সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন।

আনন্দগোপাল মজুমদার (VU2MFY)
সম্পাদক, ব্যারাকপুর অ্যামেচার রেডিও ক্লাব। □

পুস্তক পরিচিতি

মার্কস ও গণিত

প্রদীপ বক্সী ☐ জ্ঞানান্বেষণ
6 বঙ্কিম চ্যাটুর্জী স্ট্রীট কলকাতা-700073
পৃঃ 106 দাম কুড়ি টাকা

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আলোকে গণিত ও তর্কশাস্ত্রের বহু জটিল তত্ত্বের আলোচনা করার চেষ্টা বাংলা ভাষায় এই বোধ হয় প্রথম। লেখক বইটিকে দুটি ভাগে ভাগ করে গণিত ও তর্কশাস্ত্রের বহু বিভিন্ন তত্ত্বের ও সমস্যার দার্শনিক ভিত্তির দ্বান্দ্বিক আলোচনা করেছেন। বইটির ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গি স্থানে স্থানে বেশ জটিল ও দুর্বোধ্য হলেও বইটিতে লেখকের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

প্রথম অধ্যায়ে লেখক, গণিত চর্চারসাথে সাথে কেন মার্কসবাদ পড়া উচিৎ, কেন গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস জানা উচিৎ, তা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন, একশ্রেণীর গণিতবিদের অবৈজ্ঞানিক মানসিকতা, একমুখি চিন্তাধারা কিভাবে গণিতের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছেন। এই সমস্ত আলোচনা নিঃসন্দেহে যে কোন গণিতের ছাত্র তথা যারা গণিতের কোন শাখায় অথবা গণিতাশ্রয়ী কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গবেষণা করছেন, এবং মার্কসবাদে আস্থা রাখেন তাঁদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক মার্কসের গণিতবিষয়ক পান্ডুলিপির অনুবাদের সারাংশ টিকা সহকারে সন্নিবেশিত করেছেন (লেখক কিভাবে এই পান্ডুলিপির জেরক্সকপি হাতে পেয়েছিলেন তা ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন)। এই পান্ডুলিপিটি সীমা (limit) এবং অন্তরকলন (differentiation) সম্পর্কে মার্কসের ধারনা কি ছিল তা জানতে সাহায্য করে। নিউটন বা লাইবনিৎসের অনুকলন পদ্ধতি সম্পর্কে মার্কসের মতামত, এই সমস্ত পদ্ধতির অসম্পূর্ণতা কি এবং পরিপূর্ণ রূপ কি হওয়া উচিৎ, দ্যালঁবের ও লাগ্রাঞ্জের অন্তরকলন পদ্ধতি কেন যুক্তিবাদী অন্তরকলন; এই সব বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মার্কস যে সময় এই গণিত বিষয়ক পান্ডুলিপিটি লেখেন তখন আধুনিক গণিতের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। সেই সমস্ত আধুনিক গণিতের দার্শনিক ভিত্তির কোন আলোচনা মার্কস করেছিলেন কিনা তা লেখক উল্লেখ করেন নি। পরিশেষে গণিতের জটিল সমস্যার অপব্যাখ্যা, জটিল তত্ত্বের ব্যাপারে কোনো অস্বস্তির উদ্ভব ঘটলে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা করা বা মূল বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে লেখক যে আলোচনা করেছেন তা আজকের দিনে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। গণিত শাস্ত্রের তথা গণিতাশ্রয়ী বিজ্ঞানের প্রকৃত উন্নতি সাধনের জন্য যে গণিতের ইতিহাস পড়া উচিৎ, গণিতবিদদের সচেতনভাবে মার্কসবাদী—লেনিনবাদী দর্শনের চর্চা করা উচিৎ যাতে করে তাঁরা গণিতের অতীত ইতিহাস, বর্তমান সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সঠিক অনুধাবন করতে পারেন. লেখকের এই মন্তব্যটি নিঃসন্দেহে আজকের দিনের বিজ্ঞানী ও গণিতবিদদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

পরবর্তী অংশটিতে লেখক তর্কশাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্রে দ্বান্দ্বিকতা আলোচনা করেছেন। লেনিন কিভাবে অমার্কসবাদী 'পন্ডিতদের' বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার অপব্যাখ্যার জবাব দিয়েছিলেন এবং তীব্র সমালোচনা করেছিলেন তার বিস্তৃত আলোচনা আছে এই অংশটিতে। মার্কসবাদী দর্শনের উদ্ভব যে আকস্মিক নয়, কয়েকটি স্তরে এর উন্মেষ ঘটেছে এবং মার্কসপূর্ব যুগের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের বিকশিত রূপই যে মার্কসবাদ যা বাস্তবায়িত হয়েছিল কার্ল মার্কসের হাতে, তা উল্লেখ করেছেন। আকারনির্ভর ও দ্বন্দ্বমূলক তর্কশাস্ত্রের যে দ্বন্দ্ব তা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে এই অংশটিতে। এই অংশটি পড়ে বস্তুবাদী তর্কশাস্ত্র সম্পর্কে একটি ভাল ধারণা করা যাবে বলে মনে হয়। ☐

সোমনাথ চক্রবর্তী

'শব্দের সীমা' — শেষ অংশ

বেসরকারী মালিকানায় অবৈজ্ঞানিক…"—এ ন্য কিংবা সঙ্গে একমত হয়েও সেই বন্ধুটিকে আমরা "ভোটভিক্ষুক" কথাটা দিয়ে হয়ত দূরে ঠেলে দেব। কারণ তাঁর মতে তিনি তো ভোট ভিক্ষা করেন না। তিনি মানুষকে সচেতন করেন এবং সচেতন মানুষ তাকে ভোট দেয়।

এটা উদাহরণ-ই। সাধারণ-ভাবেই এই ধরনের লেখায় এমন শব্দগুলো ব্যবহারের আগে একটু সতর্ক হওয়া থাকনা যেগুলো এমন এমন প্রসঙ্গের দিকে ইঙ্গিত দেয় যা নিয়ে অনেক আলোচনা বাকি রয়েছে। কারণ আজ সে সব প্রসঙ্গ ছাড়াও বহু এখুনি-দরকারী এবং অনেককে-টানতে-পারা প্রসঙ্গকে ঘিরে নানা মতামতের লোক পাশাপাশি দাঁড়াতে পারি বোধহয়।

দুই। "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী"—ধরনের পত্রিকা সমাজের যে বেশীরভাগ অংশের সমস্যাকে তুলে ধরে, তাদের কথা বলার ভাষার তুলনায় পত্রিকার ভাষা কিন্তু একটু কঠিন হ'য়ে পড়ে। একটু ভেবে দেখলে কিন্তু বোঝা যায় যে আমরাও যখন কথা বলি যে ধরনের শব্দ ব্যবহার করি, যখন কিছু লিখি তার চেয়ে শক্ত শব্দ এসে পড়ে। পাড়ার গরীব ঘরগুলোর কিছু ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে লেখকদের অনেকেই নিশ্চয়ই কখনও কখনও মেশেন যাঁদের অনেকে বাংলা পড়তে পারেন। পারমাণবিক চুল্লী বা পরমাণু অস্ত্রের বিরুদ্ধের মত লেখাগুলোয় হয়ত সবসময় বাংলা শব্দ এবং সহজ শব্দ ব্যবহার করতে অসুবিধা হয়। তবু আমার মনে হয় যেখানে সম্ভব ইংরাজী শব্দগুলোর একটা বাংলা মানে এবং বাংলা শব্দ যতটা সম্ভব সাধারণ মানুষের কথা বলার ভাষায় লিখলে ঐ যাঁরা খানিকটা বাংলা পড়তে পারেন তাদের সুবিধা হয়। যে কোন জায়গা থেকে উদাহরণ নেওয়া যায়—যেমন ঐ লেখাটারই চার নম্বর লাইনে…"অধুনা যুক্ত হয়েছে সরকারী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র।"—না লিখে "কিছুদিন হল তৈরী হয়েছে…" অথবা খালি "এখন যুক্ত…"-ও তো লেখা যেত। "অধুনা" শব্দটা কি সাধারণত আমরা কথা বলার সময় ব্যবহার করি? বলার ভাষা আর লেখার ভাষার মধ্যে শব্দের ব্যবহার কিন্তু আমরা অভ্যাস-মতোই আলাদা ক'রে ফেলি। আর অভ্যাস হ'য়ে গেছে ব'লেই এত নজর দিতে গেলে লিখতে খুবই অসুবিধা হওয়ার কথা। তবু লেখকদের কাছে অনুরোধ একটু চেষ্টা করলে কেমন হয়? পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীও যদি একটু সতর্ক হন এবং লেখকের সম্মতি নিয়ে বক্তব্য একই রেখে একটু শব্দের অদল বদল করেন তাহলে কেমন হয়? কাজটা অনেক—তবু যতটুকু করা যায়। ☐

অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য
কলকাতা-19

পরিবেশের খবর

দূষণের দায়ে অভিযুক্ত বিড়লা গোষ্ঠী

তুঙ্গভদ্রা নদী দূষণের জন্য দায়ী করে একটি বিড়লা গোষ্ঠীভুক্ত প্রতিষ্ঠান 'হরিহর পলিফাইবার' এবং অপর একটি কোম্পানী 'গ্রাসিলিন'এর বিরুদ্ধে মামলা করেছে একটি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। তুঙ্গভদ্রার উভয় তীরের রাণীবেন্নুর এবং হরিহরের লোকজন নিয়ে গড়ে ওঠা এই সংস্থাটি কর্ণাটক হাইকোর্টে এই মামলা রুজু করেছে এবং হাইকোর্ট তা গ্রহণও করেছে। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে এই প্রথম পরিবেশ দূষণের থেকে আত্মরক্ষার জন্য জনগণ নিজেরাই জনস্বার্থের মামলা দায়ের করলেন। সংবিধানের 21 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনগণের জীবনধারণের অধিকার খর্ব করার জন্য দায়ী করে এই মামলা করা হয়েছে। এই মামলায় ঐ দুই কোম্পানী ছাড়াও রাজ্য পলুশন কন্ট্রোল বোর্ডকেও প্রতিপক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বিশাল 140 পাতার পিটিশন তৈরী করেছে বোম্বাই-এর 'লইয়ারস্ কালেকটিভ' নামে গণচেতনা-সম্পন্ন উকিলদের একটি সংগঠন।

পিটিশনে আরও বলা হয়েছে যে দূষণ মুক্তকরণে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ না কোরে এবং দায়ী কোম্পানী দুটিকে নিরন্তর নদী, মাটি ও পরিবেশকে নির্দ্ধারিত সীমার অতিরিক্ত দূষণে অনুমতি দিয়ে রাজ্য পলুশন কন্ট্রোল বোর্ড সংবিধানের 14 নং অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করছে। অন্তর্বর্তী প্রার্থনায় আবেদনকারীরা জানিয়েছেন যে ঐ দুই কারখানাকে, (1) আবর্জনা নির্গতকারী যন্ত্রগুলি বন্ধ করা ; (2) আবর্জনাগুলিকে সেচযোগ্য মানে পরিশোধন করা ; (3) নদীতে ফেলার আগে আবর্জনা-percolate করার জন্য জমি ওপর ফেলা এবং (4) পরিশোধন করার পরও যে খয়েরী রঙের ময়লা আবর্জনাতে থেকে যায় তাকে অপসারণ করার জন্য যেন নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়া রাজ্য পরিবেশ নিয়ন্ত্রককে যেন (5) অনিয়ন্ত্রিত আবর্জনা কখনও কোনো সময়ে না ছাড়া হয় তা সুনিশ্চিত করতে এবং (6) যে কোম্পানী উপরোক্ত চারটি শর্ত পালনে অক্ষম হবে তার লাইসেন্স খারিজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

গত বছরে বিপুল পরিমাণ মাছ মারা যাওয়ার সংবাদ দিয়ে আবেদনকারীরা জানিয়েছেন যে আজ নদীর জল দূষণের ফলে অব্যবহার্য হয়ে গেছে (বিজ্ঞানী মহলের সিদ্ধান্তও তাই)। হরিহর পলিফাইবার কর্তৃপক্ষ আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে ইতিমধ্যেই কিছু আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ক্ষতিপূরণের দাবী জানিয়ে বিপজ্জনক কোম্পানীগুলির বিরুদ্ধে 'ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড'-এর 133 ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার দাবীসহ পুলিশের কাছে অভিযোগ দাখিল করেছেন। পুলিশ আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় দাবী সহ পুলিশের কাছে অভিযোগ দাখিল করেছেন। পুলিশ আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় এই মামলার আবেদনকারীরা হাইকোর্টের কাছে পুলিশকে 'রিট অফ ম্যান্ডামাস' দিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

সূত্র ঃ বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড (28.12.85)

নিউক্লিয়ার ডাম্প—চীন ও সুদান

সুদানের দারফুর প্রদেশের মরুভূমিতে হাজার হাজার টন নিউক্লিয়ার আবর্জনা ফেলবার এক গোপন চুক্তি হয়েছে গত জানুয়ারী 1985-তে। চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিম জার্মানী, অস্ট্রিয়াও সুইডেন সুদানের অন্তর্গত এল ফাশের-এর উত্তরের তিনটি উপত্যকায় উচ্চ তেজষ্ক্রিয়তার নিউক্লিয়ার আবর্জনা ফেলতে পারবে।

400 কোটি ডলারের এই চুক্তিটি এ বছরের গোড়ায় সুদানের সামরিক অভ্যুত্থানের পর প্রকাশ হয়ে পড়ে। জার্মান শিল্পপতি শ্রী এফ. জে. গেটিস, যিনি বিশেষভাবে নিউক্লিয়ার আবর্জনা ফেলার কাজই করে থাকেন, সুদানে কাজটি সম্পাদন করবেন।

উটের পিঠে চড়ে প্রস্তাবিত এলাকাটিতে যাওয়া যায় এবং কিছু কিছু যাযাবর নৃগোষ্ঠীও প্রায়ই সেখানে গিয়ে থাকে। এলাকাটি বর্তমানে দুর্ভিক্ষ কবলিত, রাস্তাঘাটের অবস্থাও খুবই খারাপ। ফলে আবর্জনা পরিবহণে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা খুবই রয়েছে। তাছাড়া কোনরকম ভূপদার্থিক গবেষণা বা সমীক্ষাও করা হয়নি। ফলে ভূগর্ভস্থ জলেরও তেজষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

চীনের গোবি মরুভূমিতেও নিউক্লিয়ার আবর্জনা ফেলা হতে পারে। বিগত জুন (1985) মাসে পশ্চিম জার্মানীর আলফ্রেড, হেম্পেন, এ জি'র সঙ্গে চীন সরকারের একটি চুক্তি এই মর্মে স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে জানা গেছে। পশ্চিম জার্মানীর কোম্পানীটি এক্ষেত্রে ইউরোপীয় নিউক্লিয়ার আবর্জনা ফেলার একমাত্র অধিকারী হয়েছে। আপাতত 150 টন তেজস্ক্রিয় আবর্জনা সেখানে ফেলা হবে। পশ্চিম জার্মানী যদি 6000 টন চীনা ইউরেনিয়াম ও অন্যান্য ধাতু কেনে, তবে চীন গোবি-তে 1000 টন পর্যন্ত নিউক্লিয় আবর্জনা ফেলতে দিতে সম্মত হয়েছে!

পশ্চিমী নিউক্লিয়ার আবর্জনা ফেলবার জন্য তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশেই স্থান সন্ধান অব্যাহতভাবে চলছে। 1979 সালে প্রেসিডেন্ট সাদাতের আমলে, ইজিপ্ট এরকমভাবে অস্ট্রিয়া ও পশ্চিম জার্মানীর নিউক্লিয়ার আবর্জনা গ্রহণ করতে রাজী হয়েছিল, কিন্তু পরিবেশ আন্দোলনকারীদের চাপে তা শেষ পর্যন্ত বানচাল হয়ে যায়। দুটি জাহাজে মাল রওনাও হয়েছিল, একটি মাঝপথে যাত্রা শেষ করে দক্ষিণ ইটালীতে মাল খালাস করে। অপরটি বেশ কয়েকটি দেশে বেআইনী-ভাবে আবর্জনাগুলি ফেলে পালাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে।

আমাদের দেশেও কি এই ধরনের ডাম্পিং-এর চেষ্টা কখনও হয়েছে? জানতে ইচ্ছা করে, আমরা ভালবেসে অন্য দেশের আবর্জনা বুক পেতে নিয়েছি কি না। নাকি, উল্টে অন্য দেশে ডামপিং-এরই গৌরব অর্জন করেছি ইতি মধ্যে?

সূত্র ঃ নিউ সায়েন্টিস্ট (5.9.85), ও স্ক্রাম (SCRAM), অক্টো-নভেঃ '85

বিজ্ঞান পুস্তিকা পরিচিতি-2

ইদানীং প্রকাশিত 'বিজ্ঞান ও সমাজ' বিষয়ক বাংলা পুস্তক-পুস্তিকার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা শুরু করেছিলাম আগের সংখ্যা বি-ও-বি-তে। এবার দ্বিতীয় কিস্তি প্রকাশ করা হল। অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে প্রকাশকদের ঠিকানাতেই যোগাযোগ করতে হবে। আগের বারের মতই একটা মোটামুটি বিষয়ভাগ থাকছে।

পাঠকের অভিমত পরামর্শ যেমন সাদরে বিবেচিত হবে তেমনি লেখক-প্রকাশকদের কাছে অনুরোধ—দু'কপি পুস্তিক / পুস্তকা সহ জানান। আপনাদের উদ্যোগ ফলপ্রসূ করতে বি-ও-বি-র যৎসামান্য ভূমিকা উপেক্ষা করবেন না.....।

পরিবেশ

ভূপালঃ ঘটনা না দুর্ঘটনা ?—অন্যপত্র প্রকাশনী, গণসাংস্কৃতিক সংস্থা, পানিহাটি, 24 পরগণা, 1984, 40 পৃঃ, এক টাকা।

জীবন যেখানে বিপন্ন, সংস্কৃতির কথা বলা অবান্তর। পানিহাটির গণসাংস্কৃতিক সংস্থার প্রখর সচেতনতা ভূপালের ভয়াবহতার শবব্যবচ্ছেদ করার প্রয়াস পেয়েছে।

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু—ভূপাল কমিটি, 11 ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট, কলকাতা, 48 পৃঃ, দু টাকা।

ভূপাল দুর্ঘটনা (?)কে কেন্দ্র করে আর একটি পুস্তিকা—পাঁচটি প্রবন্ধের একটি সংকলন। ভূপাল নিয়ে আবেগ উত্তাপ, সময়ের সঙ্গে থিতিয়ে আসছে আসবে। কিন্তু ভাবনাও যদি থেমে যায় তবে সেটা হবে আত্মহত্যার সামিল। বিজ্ঞানী, পরিকল্পনাবিদ, স্বাস্থ্যবিদ, আইনবিদ, সাধারণ মানুষ সকলকেই ভাবতে হবে—কোথায় কিভাবে চলছি আমরা, উদ্ধারের পথ কি ?—সেই লক্ষ্যে একটি মূল্যবান পদক্ষেপ।

স্বাস্থ্য-চিকিৎসক-ওষধ

ডাইরিয়া—কারণ প্রতিরোধ ও সহজ ঘরোয়া চিকিৎসা—(ছন্দব্রতী স্বাস্থ্য পুস্তিকা—এক) ডাঃ ললিত কুমার খাঁড়া, ছন্দব্রতী যোগাযোগ কেন্দ্র, ধারিন্দা, তমলুক, মেদিনীপুর, পিন 721636 ; প্রকাশকাল—? 16 পৃঃ, এক টাকা।

লেখক বহুদিন ধরে স্বাস্থ্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। পেশায় চিকিৎসক। সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে যে রোগের প্রাদুর্ভাব, সামান্য সচেতনতা ও উদ্যোগেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ডাক্তার-হাসপাতাল ছাড়াই যে তার নিরাময় সম্ভব—এ পুস্তিকা সেই বিশ্বাস ও পদ্ধতির হদিস দেবে।

পেটের অসুখ—(জনস্বাস্থ্য পুস্তকমালা-এক), ডাঃ তাপস সেন, প্রকাশকঃ ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল, আহ্বায়ক, নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন, সি-7/4 লাবণি এস্টেট, বিধাননগর, কলকাতা-700064।

ভারতে প্রতি বছর পনের লক্ষ শিশু পেটের অসুখে মারা যায়। এই পুস্তিকাও পূর্বোক্ত পুস্তিকাটির মতই। এধরনের পুস্তিকার বহুল প্রচার ঘরে ঘরে পেটের অসুখ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে—সন্দেহ নেই। নির্ভেজাল ব্যবসায়ী মনোবৃত্তিসম্পন্ন ডাক্তার ছাড়া অন্য সকলেই এতে লাভবান হবেন।

অন্যান্য

বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ—উৎস মানুষ সংগ্রহ, প্রাপ্তিস্থান—কথাশিল্প, বুকমার্ক ও বুকস এন্ড নিউজ, কলেজ স্ট্রীট, 1983, 104 পৃঃ, 6 টাকা

উৎস মানুষ পত্রিকার বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত রচনার সংকলন। এই পুস্তিকা ইতিমধ্যেই সমাদৃত। জ্যোতিষ হস্তরেখা গ্রহরত্ন ইত্যাদির অবৈজ্ঞানিক স্বরূপ বুঝতে হলে এটি অবশ্যই পড়া উচিত।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে সার ব্যবহার—ডঃ শক্তিপ্রসাদ ধুয়া, প্রকাশকঃ অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত, সমতট রিসার্চ, 5/13 দেশপ্রিয় পার্ক ইস্ট, কলি-29 প্রকাশকাল ?, 22 পৃঃ, আড়াই টাকা।

শুধুমাত্র রাসায়নিক সারের উপর নির্ভর করে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা করা অনুচিত। রাসায়নিক সারের যোগান যে শুধু অপ্রতুল তাই নয়, এটা ক্ষতিকরও। বিকল্প জৈব সার যতটা সম্ভব ব্যবহার করা উচিত। তথ্যসমৃদ্ধ সহজ একটি পুস্তিকা।

বিজ্ঞান শহর থেকে দূরে (২য় খণ্ড)—ডঃ জলধর মল্লিক, অবলা প্রকাশনী, যোগেন্দ্রনগর, আগরতলা, ত্রিপুরা 1984, 34 পৃঃ, পাঁচ টাকা।

শহর থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলে বিজ্ঞানের ফসল পেঁছিবে কি করে—তার কিছু বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। ছবি এঁকে সহজ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। শহরের মানুষও এতে উপকৃত হতে পারবেন।

হরে কৃষ্ণ—মতিলাল বেরা, প্রকাশকঃ "বিজ্ঞানী মন," গ্রাম সাওড়া-বেড়্যা জালপাই, পোঃ জালপাই জেঃ মেদিনীপুর, 1985, 26, পৃঃ দেড় টাকা।

কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস মানুষের সুস্থ জীবনযাপনের পক্ষে বাধা স্বরূপ এটাই লেখকের মূল প্রতিপাদ্য। হরেকৃষ্ণ পড়ে পাঠকের মন থেকে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে অলৌকিক ধারণা মুছে যাবে লেখকের প্রত্যাশা। সরল ভাষায় সজীব ও সতেজ কিছু যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে।

গুজব ডঃ জ্যোতিষ দত্ত, প্রকাশকঃ অঞ্জনা মজুমদার, জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা 1984, 12 পৃঃ, একটাকা

গুজবে কান না দেবার গুজব থাকলেও গুজব ছড়ায়—। অভিভাবনেরই (suggestion) এক ফসল গুজব। গল্পাকারে লেখক গুজবের মনোবৈজ্ঞানিক কারণ ব্যাখ্যা করেছেন।

রবীন মজুমদার

ঐক্যময় বৈচিত্র্য

নানা রং-এর ফুলের মতোই বিচিত্র ভারতের সংস্কৃতি ; ফুলের স্তবকের মতোই আবার সে সংস্কৃতি ঐক্যময়। পশ্চিম বঙ্গের কোনো অভিনেতৃ সংঘই হোক, বা দক্ষিণের কোনো সার্কাস দল হোক ; অথবা পশ্চিমের কোনো সাংস্কৃতিক সংস্থা বা উত্তরের কোনো নাচের দল—এই উপমহাদেশের সুবিস্তৃত রেলপথের সাহায্যে বৈচিত্র্যের মহা-সমুদ্রে মিশে এক ঐক্যবদ্ধ সম্পূর্ণতায় উচ্ছল। ফুল থেকে ফুলে মধু আহরণ করে যে মধুকর ঠিক তারই মতো স্থান থেকে স্থানান্তরে মানুষ ও মালপত্র আহরণ করে নিয়ে যায় রেলপথ, এদেশের সংস্কৃতিকে নতুন জীবনে উদ্ভাসিত করে তোলে।

পূর্ব রেলওয়ে

R.N.34929/79

YEAR 9 NUMBER 4

VIGYAN-O-VIGYANKARMI
c/o D. S. Enterprise,
52/9C, B. B. Ganguli Street, Cal-12

Jan.-Feb. 1986

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে লক্ষ্মী প্রেস, 15/সি, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-9, হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।